দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।। ১২ আশ্বিন - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

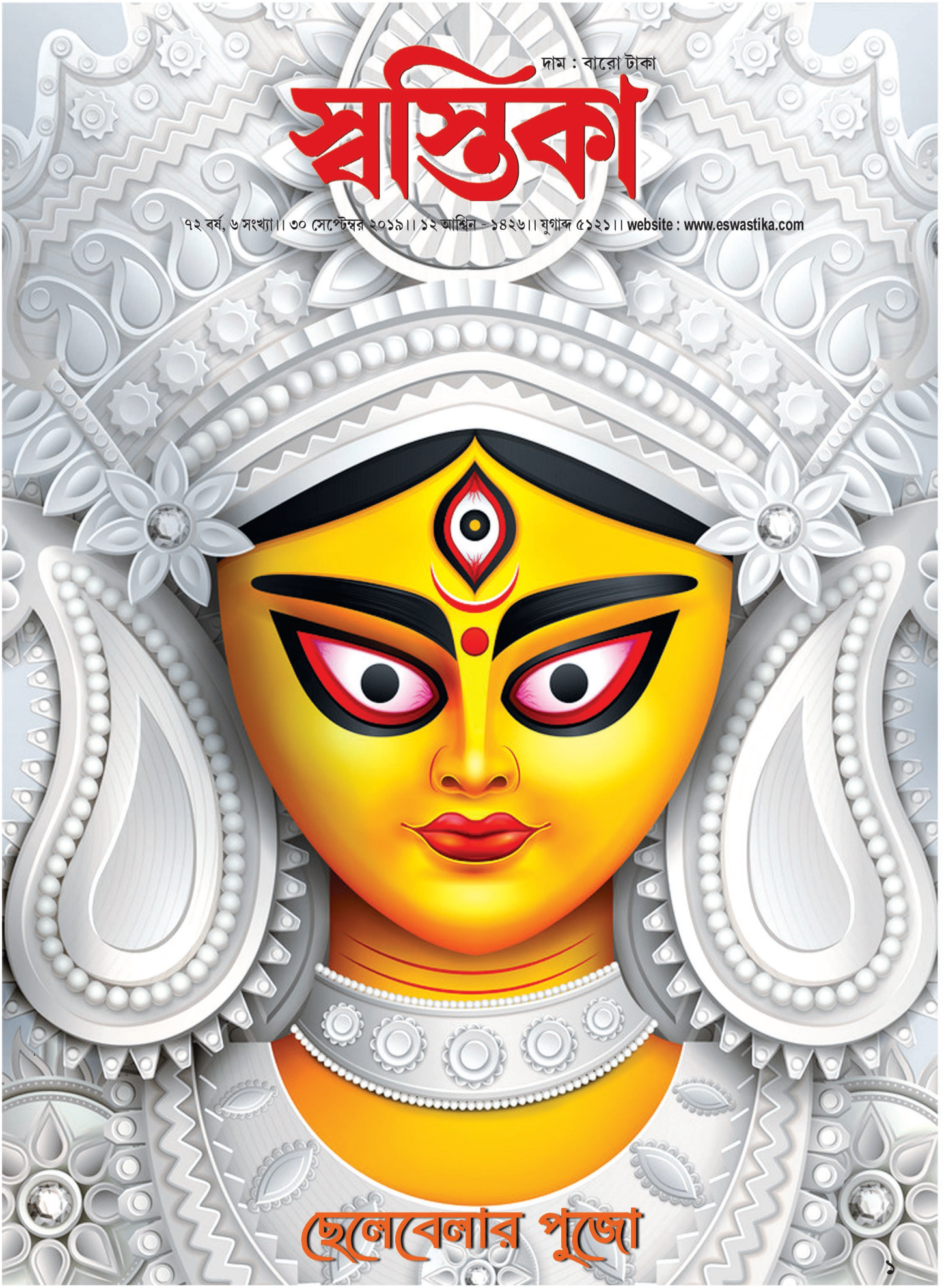

ছেলেবেলার পুজো

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৩০ সেপ্টেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

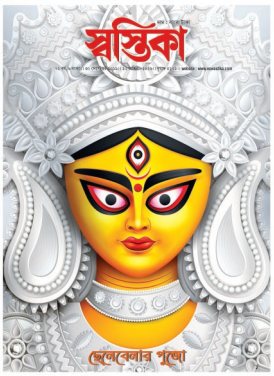

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে আপনিই ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

আনন্দময়ীর আগমনবার্তা স্বস্তিকার পুজো সংখ্যা উন্মোচনে ▯ ৭

সাক্ষাৎকার : সম্ভাব্য পরিস্থিতি এড়াতে গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই অংশ ▯ রামমাধব ▯ ৮

নাগরিকপঞ্জি অসমীয়দের অস্তিত্বের লড়াই ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১১

বালুচিস্তান বারুদের স্তূপে, যে কোনো সময় ফেটে পড়তে পারে ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ১৩

'রাম কে নাম' তথ্যচিত্রের উদ্দেশ্য হিন্দু ইতিহাসের বিকৃতি ▯ সুমন চন্দ্র দাস ▯ ১৫

মিথ্যা প্রচারের শিকার দেশের অর্থনীতি ▯ পবন চৌধুরী ▯ ১৭

আমেরিকায় বসবাসকারী আত্মানুসন্ধানে ব্রতী তরুণ প্রজন্মের মনের কথা ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৮

ছোটোবেলার মতো আজও একইভাবে দুর্গাপূজা উপভোগ করি ▯ সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল ▯ ২৩

মহালয়ার দিন থেকে পুজো শুরু হয়ে যেত ▯ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ▯ ২৫

ছেলেবেলার দুর্গাপূজার কিছু স্মৃতি ▯ শিশিরকুমার গাতাইত ▯ ২৬

আবার এসো ▯ অভিজিৎ রায়চৌধুরী ▯ ২৭

সাক্ষাৎকার : সন্ধ্যারতির প্রসাদ সাতহাজার চন্দ্রপুলি ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

তালতলা পালবাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপূজা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

যা হারিয়ে যায় ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

এলাটিং বেলাটিং সই লো ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৭

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয় ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৪৩

কাশ্মীর সমস্যা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির ফসল ▯ নিধুভূষণ দাস ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২১ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২১ অক্টোবর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ অক্টোবর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জগজ্জননী শ্যামা

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২১.১০.১৯ তারিখে। বিষয় জগজ্জননী শ্যামা। বঙ্গপ্রদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মহাকালীর পুজো প্রচলিত। বস্তুত, মহাশক্তির সাধনার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত এই বঙ্গপ্রদেশ। আমরা সাধক বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্তের মতো কালীসাধককে পেয়েছি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা থাকবে জগজ্জননী শ্যামা সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা। লিখবেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, অভিমন্যু গুহ এবং সপ্তর্ষি ঘোষ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উৎসবের দিন

বঙ্গপ্রদেশ বরাবরই মাতৃপূজার পীঠস্থান। বাঙ্গালি মাতৃপূজনের ভিতর দিয়াই শক্তির আরাধনা যেমন করিয়াছে, তেমনই দেশবন্দনাও সে করিয়াছে মাতৃপূজনের মধ্য দিয়াই। শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতের সঙ্গে বাঙ্গালির গৃহে আবার মাতৃপূজার আয়োজন শুরু হইয়াছে। ঋতু চক্রে শরৎকালটি এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত হইয়া মর্ত্যে মাতৃ আগমনের বার্তা বহিয়া আনে। বর্ষার পর এই ঋতুটিতে পৃথিবী স্নিগ্ধ, সবুজ। নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। ধান্যক্ষেত্রে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। শস্য পরিপূর্ণা এই বাঙ্গলার তখন এক হৃদয়হরণকারী রূপ। এমনই একটি সুন্দর আবহে দেবীপক্ষের মধ্য দিয়া বাঙ্গালির মাতৃ আরাধনার শুরু। শরৎকালে এই দেবী আরাধনার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রহিয়াছে। সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা অভিযানের সময় শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে মাতৃ আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের শরতের মাতৃআরাধনাকেই বাঙ্গালি তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব হিসাবে মানিয়াছে। শরতের এই মাতৃপূজার ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালির সহিত শ্রীরামচন্দ্রেরও এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালি নানারূপের ভিতর দিয়া মাতৃ আরাধনা করিয়া আসিতেছে। শরতকালে দেবীর মর্ত্যে আগমনকে সে কন্যা উমার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন রূপে দেখিয়াছে। কন্যারূপে দেবীকে বরণ করিয়াছে বাঙ্গালি। শ্বশুরালয় হইতে মাত্র কয়দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসিলে কন্যা যেমন পিতা-মাতার স্নেহ ভালোবাসা লাভ করে— তেমনই স্নেহ ভালোবাসায় তিনটি দিবস দেবীকে আরাধনা করে বাঙ্গালি। তখন দেবী তাহার কাছে কোনো দূরলোকবাসিনী নন। বরং ঘরের কন্যা উমা। বাঙ্গালি পরিবারেও এই সময় শ্বশুরালয় হইতে কন্যা আসিয়া কয়টা দিন পিতা-মাতার সহিত অতিবাহিত করিয়া যায়। শরতের এই উৎসব সেই আনন্দের উৎসব, গৃহে প্রত্যাবর্তনের উৎসব।

শরতের এই দেবী আরাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালি শক্তি আরাধনাও করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার আনন্দমঠ উপন্যাসে এই শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক মহেন্দ্রকে সন্ন্যাসী অসুরদলনী দেবী দুর্গার রূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন, 'মা যা হইবেন।' স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীই দুর্গাপূজাকে শক্তি আরাধনা রূপেই দেখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী রূপের ভিতর তাঁহারা দেশমাতৃকাকেও স্মরণ করিয়াছেন। দেবীর আরাধনা দেশজননীর আরাধনায় পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালি তাহার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসবে কাহাকেও ব্রাত্য রাখে নাই। আর্য, অনার্য, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, পারসিক, খ্রিস্টান—এই উৎসবে সকলের জন্যই দ্বার অবারিত, উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে বাঙ্গালি। শাশ্বত ভারতের যে বাণী—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—তাহাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালির এই উৎসবে। বাঙ্গালির দুর্গাপূজা যেমন সর্বজনের, সর্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে, আর কোনো ধর্মের কোনো ধর্মীয় উৎসবই এইরকম সর্বজনীন হইয়া উঠে নাই। এই উৎসবের দিনগুলিতে বাঙ্গালি তাহার বিষাদ ভুলিয়াছে। জগতের আনন্দযজ্ঞে সে একজন অংশীদার হইতে চাহিয়াছে। দ্বেষ, দ্বন্দ্ব দূরে সরাইয়া রাখিয়া এই শরতের পুণ্য প্রভাতে সে এক সুখীসমৃদ্ধ জীবনেরই স্বপ্ন দেখিয়াছে।

মাতৃ আরাধনার পুণ্য লগ্নে আমরাও দেশ এবং জাতির সমৃদ্ধি কামনা করি। স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষ হইতে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক, পাঠক, এজেন্ট এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা। পূজার দিনগুলি আপনাদের ভালো কাটুক—এই প্রার্থনা করি।

সুভাষিতম্

অথ যে সংহতা বৃক্ষাঃ সর্বতঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
ন তে শীঘ্রেণ বাতেন হন্যন্তে হ্যেকসংশ্রয়াৎ।।
যে বৃক্ষ এক সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে বদ্ধমূল থাকে, তারা ভীষণ ঝড়-তুফানেও ধ্বংস হয় না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে, আপনিই

যাদবপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে নিগ্রহের ঘটনার পরদিন অতি বামেদের প্রচ্ছন্ন মদতদাতা একটি দৈনিক সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বাংলা পত্রিকায় ভেতরের পাতায় ছোট্ট এক টুকরো সংবাদটি অনেকেরই নজর এড়িয়ে গিয়েছে। শ্রীনগর থেকে জনৈক কাশ্মীরি সাংবাদিক রিপোর্ট করেছেন যে, সেখানে যারা এতদিন সেনাবাহিনীর ওপর পাথর ছুঁড়ে এসেছে, তারাই এখন নিরাপত্তাবাহিনীকে চা খাওয়াচ্ছে। এতে নাকি গোয়েন্দারা বিশাল ভাবনায় পড়েছে ইত্যাদি। আসলে ভাবনাটা গোয়েন্দাদের নয়। ভাবনাটা জইশ-ই-মহম্মদ আর ভারতে তার এজেন্টদের, যে এজেন্টদের 'নকশাল', 'মাওবাদী', নিদেন 'কমিউনিস্ট' বলা চলে। এই এজেন্টদের মদতদাতা ওই পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি সংবাদপত্রের খোদ সম্পাদক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওপর হামলায় দোষ খুঁজে পান না, অবমাননাকর মন্তব্য করেন। আর বাংলা সংবাদপত্র গোষ্ঠীর তো কথাই নেই। 'খোদা' খ্যাত কবি-কন্যা যাকে 'ডিফ্যান্টো এডিটর' বলা চলে, নকশালি 'এডিটর' অন্তত খাতায়-কলমে আর পুরো এডিটোরিয়াল বাহিনী কাগজে আর ফেসবুকে মাঠে নেমে পড়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওপর হামলার সমর্থনে।

কোনও সভ্য দেশে এই জিনিস ভাবা যায় না। দিনের পর দিন এই সংবাদমাধ্যম কাশ্মীরের মানুষদের ওপর সেনাবাহিনীর অত্যাচারের গল্প শুনিয়েছে ৩৭০ বিলোপকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বাবুল সুপ্রিয়ের ওপর হামলার ঘটনার পরদিন সংবাদ কভারেজে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উঠেছে। সুখী কাশ্মীরের ছবি উঠে এসেছে, কিছুটা অজান্তেই। তাহলে এই মিথ্যাচারের বিচার কবে হবে? গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের এই কদাকার যে ভূমিকা দেখা গেল, তারপরও গণতন্ত্র নিয়ে বড়াই করা সাজে না। এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলতেই হবে। আমার এক কমিউনিস্ট বন্ধু চীন ঘুরে এসে আমায় বলেছিলেন, আশ্চর্য ব্যাপার! গোটা চীন ঘুরে কোথাও তো লেনিন, স্ট্যালিন, এমনকী মার্কস, এঙ্গেলস-এর ছবি চোখে পড়ল না কোথাও! আসলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও প্রবলভাবে ন্যাশনালিস্ট। বিশেষভাবে ইম্পেয়ারিলিস্ট, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী।

বিশ্বামিত্র-র কলম

আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ঠিক উল্টো। চীনের দালালি করা জন্য যে কমিউনিস্ট অংশটির জন্ম হয়েছিল '৬৪-তে, তার কয়েক বছরের মধ্যে আবার এর ভাঙনের মধ্যে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। একটি অংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ঘুণ ধরাবার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে আরেকটি অংশ 'বিপ্লবে'র নামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে ভারতবর্ষীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের চেষ্টা করেছে। এগুলি সাতের দশকের কথা। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় গণতন্ত্রে নানান ওলট-পালট হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ কমিউনিস্টদের বিষবৎ বর্জন করেছেন, আজ স্বদেশপ্রেমী নাগরিকদের কাছে এরা ঘৃণার যোগ্য।

ফলে টিকে থাকতে, বিদেশি রাষ্ট্রের দালালি করতে কমিউনিস্টদের নানা ফিকির পন্থা খুঁজে নিতে হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক একটা শ্রেণী সুযোগ বুঝে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছিল। বিগত নির্বাচনে সেই জাহাজেও জল ঢুকছে বুঝে এবার তারা নিরাশ্রয়, ফলে আরও বেশি মরিয়া। গত নির্বাচনে প্রচারের ক্যাম্পেনে ওই সংবাদপত্রটির ডি-ফ্যাক্টো এডিটর তো প্রকাশ্যে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার সওয়াল করেছিলেন। আজ ফিনিক্স পাখির মতো অবলুপ্ত কমিউনিস্টদের অক্সিজেন যোগানোর কাজ এই গোষ্ঠীটি করে চলেছে, কখনও কাশ্মীর জুজু, কখনও এনআরসি জুজু, আবার কখনও জেএনইউ, যাদবপুরে উস্কানি দিয়ে। এদের সম্পাদকীয়তে জইশের গুণগান করা হয়, প্রথম পাতার হেডলাইনে 'অভিনন্দন পাকিস্তান' লেখা হয়। স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর আমলে কমিউনিস্ট-জেহাদি-মুসলিম লিগ জোটবন্ধন, এখন চীন-পাকিস্তান সখ্যের দিকে তাকালে বুঝবেন ওই পত্রিকাগোষ্ঠী সেই ধারাকেই বহন করে নিয়ে চলেছে, যা 'সমৃদ্ধ ভারত--- সমর্থ ভারত' চিন্তা-চেতনার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

দেশের মানুষ যেমন কুলোর হাওয়া দিয়ে দেশদ্রোহীদের বিদায় করেছেন, দেরিতে হলেও জে এন ইউ-যাদবপুরেও একদিন 'সূর্যের ভোর আসবেই'। যাদবপুরে এবিভিপির শক্তি বাড়তেই তাই আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ভারতীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর অভ্যন্তরস্থ ঘুণপোকা, ও 'বিপ্লবী' ঘুণপোকাদের যৌথ আক্রমণে। যাদের তাত্ত্বিক সমর্থন ওই সংবাদগোষ্ঠীর এডিটোরিয়াল গোষ্ঠী ও এদের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা করছেন। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এই 'ফ্যাসিবাদ', 'অসহিষ্ণুতা'র যে গল্প জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে চালানো হয়, সেই 'ফ্যাসিবাদ', 'ইনটলারেন্স' ছাড়া কমিউনিজম টিকবে না, বিশ্বের ইতিহাস সেই শিক্ষাই দিয়েছে। এদের উপরে দেশের মানুষ ফেলেছেন, ছাত্র-ছাত্রীরাও তার ব্যতিক্রম হবেন না। শুধু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মুখোশ পরে থাকা জঙ্গি-সমর্থক তথাকথিত 'সংবাদমাধ্যম'টির প্রকৃত মুখটা সবার দেখা উচিত, নইলে বিশ্ব-মানবতা লাঞ্ছিত হতে দেরি হবে না।

আনন্দময়ীর আগমনবার্তা স্বস্তিকার পুজোসংখ্যার উন্মোচনে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বঙ্গপ্রদেশে মা দুর্গা আনন্দময়ী রূপে পূজিত হন। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বাঙ্গালির দৈনন্দিন জীবনযাপনে যেমন আনন্দের ছোঁয়া লাগে, ঠিক তেমনই আনন্দের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয় বাঙ্গালির সারস্বত চর্চাতেও। যার প্রকাশ দেখতে পাই পুজোসাহিত্যে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার চিত্র-বিচিত্র পুজোসংখ্যায়।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকার এ বছরের (১৪২৬) পুজোসংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়ে গেল গত ২৩ সেপ্টেম্বর, মাণিকতলার কল্যাণ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার শতাধিক লেখক এবং বুদ্ধিজীবী। সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন বৈতানিকের প্রাক্তন রাজ্যসম্পাদক এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অমিত দাশ। প্রধান বক্তা ছিলেন কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক এবং অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির রাজ্য সম্পাদক রবিরঞ্জন সেন।

প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথিদের বরণ করে নেন স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক বিজয় আঢ্য এবং সহ-সম্পাদক সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল। স্বাগত ভাষণে পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, স্বস্তিকার পথ কোনওদিনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু ঝড়ঝাপটা সহ্য করে স্বস্তিকাকে সত্তর বছরের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং লেখক অভিজিৎ দাশগুপ্ত স্বস্তিকার পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত রচনাগুলির একটি মনোজ্ঞ পর্যালোচনা উপহার দেন। প্রধান বক্তা রবিরঞ্জন সেন বলেন, বামপন্থী লেখক বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে শুধুমাত্র সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার জোরে ওরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দখল করে নিয়েছেন। কথাটা নেহাতই একপেশে। কারণ আজকের জায়গায় পৌঁছনোর জন্য ওরা এক সময় যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিলেন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জিষ্ণু বসু রবিরঞ্জন সেনের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করার জন্য আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে। সভামুখ্যের ভাষণে অমিত দাশ আজকের পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। দুটি সুন্দর একক গীত পরিবেশন করেন হরিমোহন দাশ এবং কৌশিক বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ■

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে আগাম গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক কার্যকলাপেরই অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে দিল্লিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রী রামমাধব শেখ আবদুল্লার বহু বছর কারাবাসের কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকারটি এখানে অনুদিত হলো।

সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই অংশ : রামমাধব

□ অসমে চূড়ান্ত নাগরিকত্ব তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বিজেপির মধ্যেই কিছুটা অসন্তোষ উঁকি মারছে। পুষ্করে সদ্য শেষ হওয়া আর এস এস কার্যকর্তাদের বৈঠকে আপনি এ নিয়ে বলেছেন।

রামমাধব : হ্যাঁ, চূড়ান্ত নথিবদ্ধ নাগরিক তালিকা দিন দশেক আগে প্রকাশিত হয়েছে, এর সমস্ত খুঁটিনাটি কিন্তু এখনও সরকারের হাতে আসেনি। এগুলি এখনও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জিম্মায় রয়েছে। তাঁরা সবকিছুই সর্বোচ্চ আদালতের হাতে তুলে দেবেন। বিষয়টার সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে আসার পর যা করণীয় থাকবে সেগুলি এ বিষয়ে যুক্ত থাকা ব্যক্তিরাই ঠিক করবেন। অবশ্যই এ নিয়ে নাগরিকদের কিছু কিছু অংশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁরা এই প্রক্রিয়ার পুনর্নিরীক্ষণ চাইছেন।

বাস্তবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ের তরফ থেকেই অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ক্ষেত্রে অন্তত ২০ শতাংশ এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে ১০ শতাংশ নাগরিকদের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বেছে নিয়ে পুনঃপর্যালোচনা করার অনুমতির জন্য সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়। মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা দানা বাধছে যে অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড়ো অংশ এন আর সি-তে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে ফেলেছে। অপরদিকে বৈধ নাগরিকদের বেশ বড়োসড়ো অংশের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গেছে। আমাদের করা উল্লেখিত অনুরোধ আদালত গ্রাহ্য করেনি। তবে সবরকম খুঁটিনাটি দেওয়া তালিকা প্রকাশিত হলেই আমরা বিষয়টা নিয়ে আবার এগিয়ে যাব। একজনও বৈধ নাগরিক যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে আমাদের দল ও সরকার দায়বদ্ধ।

□ অসমে দলের রাজ্য নেতারা তো বেশ মুষড়ে পড়েছেন। তাদের ক্ষোভ প্রশমনের কথা কী ভাবছেন?

রামমাধব : এন আর সি অসমবাসীদের একটি অতি দীর্ঘদিনের দাবি। আমরা দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এটিকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরও যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছুটা ন্যায়সঙ্গত। এই আশঙ্কার প্রত্যেকটিকেই ভিন্নভিন্নভাবে সমাধান করতে হবে।

একটি পথ হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবার নতুন যুক্তি ও আবেদন নিয়ে ফিরে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, আমরা সমগ্র দেশবাসীকে কথা দিয়েছি যে আমরা সারা দেশেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লাগু করব। এই বিল আইনে পরিণত হয়ে গেলেই এই সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির দিকে নজর দেওয়া হবে।

তৃতীয়ত, যাদের নাম এন আর সি তালিকায় জায়গা পায়নি তারা অনায়াসে অসমে কার্যকর থাকা কয়েক শো ফরেনার্স ট্রাইবুনালে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন এর পরও উচ্চ আদালত তো খোলাই আছে।

কারাগারে শেখ আবদুল্লা (১৯৫৩)।

□ বৈধ নাগরিকদের নাম এইভাবে বাদ পড়ার জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন?

রামমাধব : এই কারণেই তো সংশ্লিষ্ট কেসগুলির পুনর্নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ক্ষেত্রে। এটি নিতান্তই একটি প্রক্রিয়াগত বিষয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ নিয়ে অভিযোগ করা ঠিক নয়। বরঞ্চ আমরা খুশি যে আমরা সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে সমাপ্ত করতে পেরেছি। এই গোটা কর্মকাণ্ডটিই কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে হয়েছে।

□ আচ্ছা, শেষাবধি যে ফলাফল বেরিয়ে এল তা বিজেপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চরম ভীতির কারণ একথা তো দল বার বার বলে এসেছে।

রামমাধব : বিষয়টা বিজেপির এজেন্ডা বলে দেগে দেওয়া ঠিক নয়। এটা ঠিকই অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে আমাদের সহ্যের সীমা শূন্য। ঠিক যেমন সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রেও আমাদের সহিষ্ণুতার মাত্রা শূন্য। মনে রাখা দরকার অবৈধ অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেমন বিপদ ঠিক তেমনই দেশের মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রেও সমান বিপজ্জনক। অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের পন্থা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। সিপিআই দলের বহুবারের সাংসদ ও পূর্বতন গৃহমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এক সময় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন অসমে ১ কোটিরও বেশি সংখ্যার বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আছে। তাই এটা কখনই একা বিজেপির বিষয় নয়। সমস্ত দলই এই সমস্যার কথা মেনে নিয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সহ্য করে না।

□ আপনি কী মনে করেন অন্যান্য অনেক রাজ্যেই এবার এনআরসি-র দাবি উঠতে চলেছে?

রামমাধব : অনেক রাজ্য সরকার ও বহু রাজনৈতিক নেতা তাদের নিজ নিজ রাজ্যে এই প্রক্রিয়া চালু করার কথা বলেছেন। আমি নিশ্চিত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী এ সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ মতামত দেবেন। সব সময় সংখ্যাটাই বড়ো কথা নয় যদি ধরে নেওয়া যায় যে আপনি ১৫ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। সেটা আদৌ খারাপ নয়। নিশ্চয় এক্ষেত্রে হয়তো আপনার মনে হতে পারে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটা তো মানতে হবে আপনি ১৫ লক্ষকে অন্তত চিহ্নিত করতে পেরেছেন। অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ শুরু হয়েছিল সংসদের একটি আইন বলে। এখন সারা দেশের ক্ষেত্রে গৃহমন্ত্রক কী ব্যবস্থা নেয় সেটা আমরা সময়ে দেখতেই পাব।

□ কাশ্মীরে যে সমস্ত মূলধারার রাজনীতিবিদ উপত্যকায় বরাবর দেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন তাঁদের এত দীর্ঘদিন গৃহবন্দি রাখার বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখছেন।

রামমাধব : এই প্রশ্নটা কারা আমাদের করছে? রাজনৈতিক নেতাদের কোনো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিবর্তনমূলক আটক করা হয়ে থাকে। এটি সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা অঙ্গমাত্র। তাছাড়া কাশ্মীরে একটা বিশেষ বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতেই সেখানকার বর্তমান প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

মনে রাখতে হবে এমন আগাম সাবধানতামূলক গ্রেপ্তারি অতীতেও হয়েছে। আমি কোনো তুলনা টানছি না। শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই ফারুক আবদুল্লার পিতা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ১৯৫৩ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দীর্ঘকাল কারাবাস করেছিলেন। যদি বলেন কেন এটা করা হয়েছিল? উত্তর হবে একই— তখনকার পরিস্থিতিতে নিশ্চয় তার প্রয়োজন ছিল।

□ কিন্তু কাশ্মীরের সমস্ত নেতাই প্রায় ১ মাসের ওপর গৃহবন্দি আছেন। এরকম কতদিন চলবে?

রামমাধব : এটি স্থানীয় প্রশাসনের নেওয়া একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো অবনতি না হয়। ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর থেকে লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে আমরা যে সাহসি পদক্ষেপ নিয়েছি তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। এত বড়ো একটা সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় সেখানে যাতে অসন্তোষ বিক্ষোভ শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না করে তা নিশ্চিত করতেই নেতাদের সাময়িকভাবে গৃহবন্দি রাখা হয়েছে। জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেই তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে।

একটা কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। সংবিধানের দোহাই দেওয়া বা জাতীয় পতাকা হাতে নেওয়া কোনো দাতব্যমূলক কাজ নয়। যে ব্যক্তি ভারতের রাজনীতিক হিসেবে কোনো দল পরিচালনা করবে দেশের সংবিধান অনুযায়ী উল্লেখিত কাজ দুটি তার অবশ্য কর্তব্য। তাই সংবিধান আর পতাকা ধরলেই যদি কেউ ভেবে থাকে সে এমন দেশসেবা করে ফেলেছে তাকে আর দেশের স্বার্থে কখনই আটকানো যাবে না তা মহা ভুল।

□ আপনি সদ্য সদ্য আর এস এসের বৈঠক থেকে ফিরেছেন সেখানে অর্থনীতির শ্লথগতি নিয়ে কী উঠে এল?

রামমাধব : দেখুন সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে তুলনা করলে ৫ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি মোটেই খারাপ নয়। সারা বিশ্বের জিডিপি ২ শতাংশের আশপাশে ঘোরা ঘুরি করছে। সেই নিরিখে আমরা আমাদের অর্থনীতি পরিচালনা ঠিক লক্ষ্যেই করেছি। এটা বলার পরও আমি কখনওই অর্থনীতির চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করছি না। দেশের অর্থমন্ত্রী ও সরকার এ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ও চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। গত দু' সপ্তাহে অর্থনীতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিমার্জন তাঁরা করেছেন।

(সৌজন্য টাইমস অব ইন্ডিয়া)

রম্যরচনা

ক-এর কেরামতি

কাকলি করুণা কাকিমাকে কহিল—

কাকি, কলকাতায় কাকা কী কী কাজ করেন?

কাকি কহিল— কখনো কলকাতায় কোতোয়ালের কুটিরে কাজ করেন।

কখনো কলম ও কালির কাঁচামাল কেনেন।

কখনো কিতাব কেন্দ্রের কাজ করেন। কখনো কুলির কাজ করেন।

কখনো কলার কাঁদি কেনেন। কখনো কাঠ কেটে কেটে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন।

কখনো কয়লার, কখনো কলের, কখনো কারিগরি কারখানায় কাজ করেন। কখনো কিছু করেন না।

কাকলি কহিল— কাকি কিছু কাজের কথা কহেন।

কাকি কহিল— কথা কহিয়ো কম কম। কস্মিনকালেও কাহাকে কোনো কটু কথা কহিয়ো না। কখনো কপাল কুঞ্চিত করিয়া কথা কহিয়ো না। কোকিলকণ্ঠে কথা কহিয়ো।

উবাচ

"জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস রাজনীতি খুঁজছে, অথচ আমাদের কাছে এটি দেশাত্মবোধক সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে এটাই ফারাক।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মুম্বাইয়ে এক নির্বাচনী জনসভায়

"আমেরিকা সব সময় ভারতের পাশে আছে। ইসলামিক সন্ত্রাস দমনে ভারতে সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে আমেরিকা। মোদী আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

'হাউডি মোদী' অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের মন্তব্য

"বিদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। কারণ তখন তিনি বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।"

শশী থারুর
কংগ্রেস নেতা

পুনায় কংগ্রেসের একটি সভায় মন্তব্য

"এন আর সি বিল আমরা আনছি। সব শরণার্থীকে আমরা নাগরিকত্ব দেব। যেটা আগে কেউ দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা আটকাতে পারবেন না।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি
তথা সাংসদ

উলুবেড়িয়ায় দলীয় সমাবেশে

"কিছু লোক যারা নিজেদের দেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের ভারতের কাশ্মীর নীতি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাদের রাজনীতি ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। আপনারা এবং সারা বিশ্ব জানে তারা কারা।"

রাজনাথ সিংহ
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের বিষোদ্‌গার প্রসঙ্গে।

নাগরিকপঞ্জি অসমীয়দের অস্তিত্বের লড়াই

কে. এন. মণ্ডল

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে অসমবাসীদের মধ্যে আবেগ এবং আশঙ্কা স্বাভাবিক। সাংবিধানিকভাবে অসমে নাগরিকপঞ্জির কাজ ১৯৫১ সালের আদমশুমারির পরে শুরু হলেও এর বীজ বপন হয় আরও আগে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আর্থিকভাবে দুর্বল অসমকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানোর প্রয়াসে, অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সমৃদ্ধ সিলেট জেলাকে বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসম প্রদেশে জুড়ে দেয় ১৮৭৪ সালে। এর ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা গতি এলেও, জনবিন্যাসের উপর এর প্রভাব পড়ে— অসমীয়রা বাংলাভাষীদের কাছে গরিষ্ঠতা হারায়। এমনকী ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ববঙ্গ এবং সিলেটের মানুষের কাছে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। ফলে ঈর্ষা এবং ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তার প্রতিফলন ঘটে, ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কাছে অসমের প্রধানমন্ত্রী (স্বাধীনতার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীদের পদের নাম) গোপীনাথ বরদলইর সিলেটকে বঙ্গপ্রদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার সুপারিশে— অসমীয়দের অস্তিত্বের সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যে।

১৮৭৪ সালের পর অসমীয়দের জাত্যভিমানের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অসম প্রদেশকে পূর্ববঙ্গে জুড়ে দিয়ে। পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৫টি জেলা এবং অসম বাকি জেলাগুলির সঙ্গে ওড়িশা এবং বিহারকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ হয়। নবগঠিত পূর্ববঙ্গে মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ মুসলমান গরিষ্ঠতা। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ ভাগের ঘোষিত নীতির প্রেক্ষিতে যতই প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলুক না কেন--- আসল উদ্দেশ্য ছিল devide and rule। আর সেকথা কার্জন সাহেব চেপেও রাখেননি। ঢাকায় কার্জন পরিষ্কার করে বলেন, মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ রচনাই তাঁর লক্ষ্য। শুধু কি তাই, নামমাত্র সুদে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে ১ লক্ষ পাউন্ড ধার দেন। যে টাকা খরচ করে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লিগের জন্ম হয়। তবে মুসলিম লিগ পাকিস্তান হাসিল করতে পারলেও কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ ঠেকাতে পারেনি। মুসলমান নেতাদের সমর্থন পেলেও বাঙ্গালি হিন্দু এবং মধ্যবিত্তদের চাপ এবং স্বদেশীদের ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন এবং চরমপন্থীদের প্রতিরোধের মুখে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে। অসম পূর্ববঙ্গ থেকে মুক্তি পায়, তবে সঙ্গে সেই সিলেট। ওই বছরই কলিকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লি স্থানান্তরিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে সিলেট অসমের গলার কাঁটা। আর এই কাঁটা ছাড়ানোর সুযোগ এল ৭ জুলাই ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে। সিলেটে গণভোট, উদ্দেশ্য তারা ভারতে না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সেটা ঠিক করা। সিলেট ছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও গণভোট হয়েছিল।

সংখ্যাটি যতই হোক, একথা ঠিক বাংলাদেশ একজন মানুষকেও ফিরিয়ে নেবে না। সুতরাং সর্বশেষ বাছাইয়ের পরে বাদ পড়া মানুষজনকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে হয় অসম বা অন্য কোথাও পুনর্বাসিত করতে হবে। কেননা বিদেশিদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যায় না।

কারণ ওখানের মুসলমান প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। এমনকী দ্বিজাতিতত্ত্বকে তিনি ইসলাম বিরোধী বলেছেন। দু'টি ক্ষেত্রেই গণভোটের রায় যায় পাকিস্তানের পক্ষে। তবে সিলেটের ক্ষেত্রে অসমের প্রধানমন্ত্রী বরদলইর ভূমিকা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদেরও বিমূঢ় করেছে। সিলেটকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য, মুসলিম লিগকে ভোটে সন্ত্রাসের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া ৮ হাজার চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি বহিরাগত এই অজুহাতে। জানা গেছে, মুসলিম লিগ ভোটে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে বিহার, দিল্লি উত্তরপ্রদেশ থেকে মস্তান এনেছে। ফলে ভারত হারাল সিলেটের মতো একটি সমৃদ্ধ জেলা। এক্ষেত্রে কেউ কেউ তপশিলি নেতা যোগেন মণ্ডলের ভূমিকাও আংশিক দায়ী বলে মনে করেন।

অসমীয় মনস্তত্ত্বে বাঙ্গালি আধিপত্যের ভয় এতটাই বাসা বেঁধেছিল যে বাঙ্গালিদের ন্যায্য দাবি বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিলেও, বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পেতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দাঙ্গায় ৯ জন হিন্দু বাঙ্গালি এবং বরাক উপত্যকায় (শিলচরে) পুলিশের গুলিতে ১১টি তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিতে হয়। অথচ এই বাংলাভাষার স্বীকৃতির আন্দোলনে অসমের মসুলমান সম্প্রদায়ের কোনো ভূমিকা ছিল না— তারা কোনোভাবেই হিন্দু বাঙ্গালিদের আন্দোলনের সঙ্গী হতে চাননি। এর বড়ো কারণ অসম-সহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয়দের ভাষা সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছে, এমনকী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের তাদেরই একজন করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ধর্ম সাহায্য করেছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অসমে বাংলাদেশি মুসলমানরা মূল স্রোতে মিশে গিয়ে নিজেদের অহমীয় পরিচয় দিচ্ছে। ফলে অসমীয়দের রোষ এবং ঈর্ষা মূলত হিন্দু

বাঙ্গালি কেন্দ্রিক। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে অসম থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বললে সহজেই এর যথার্থতা জানা যাবে। অসমে বাঙ্গালি খেদাও আন্দোলন বা বাঙ্গালি বিদ্বেষের অভিমুখ কখনো মুসলমানরা ছিল না— একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৮৩ সালে নেলীর হত্যাকাণ্ড। সাম্প্রতিককালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান তথা সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন মুসলমান সংগঠনের ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ, অসমের যুবশ্রেণীকে বাঙ্গালি (হিন্দু) বিরোধিতা থেকে বিরত করেছে।

২০১৮-র জুলাইয়ে প্রকাশিত NRC রিপোর্টে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম জায়গা না পেলেও, ২০১৯-এর ৩১ আগস্ট সে সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ লক্ষ ৬ হাজার। এছাড়াও রয়েছে ২ লক্ষ ৪৮ হাজার D-Voters। NRC কর্তৃপক্ষ বাদ যাওয়া নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও ১২০ দিন সময় দিয়েছেন। কারণ বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ এসেছে অনেক ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ভূমিপুত্রের নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি করেছেন অসমের প্রভাবশালী অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এও বলেছেন, উদ্বাস্তুদের রিফিউজি সার্টিফিকেটের মান্যতা দেওয়া হয়নি। এমনকী জনপ্রতিনিধি-সহ সেনাকর্মী এবং অনেক বিশিষ্টদের নাম বাদ পড়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে, এন আর সি কর্তৃপক্ষের যে গুরুত্বের সঙ্গে নথিগুলি তৈরি করা উচিত ছিল সেখানে গাফিলতি ছিল। দেখতে হবে যাতে প্রকৃত ভারতীয় একজন মানুষেরও নাম বাদ না পড়ে। আর এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মিঃ প্রতীক হাজেলার। সময়সীমা ধরে রিপোর্ট বের করার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নির্ভেজাল রিপোর্ট। কারণ এটি একজন নাগরিকের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা। ২০১৩-তে অসমে কংগ্রেস আমলে এন আর সি প্রক্রিয়া শুরু হলেও এর অভিঘাত বর্তমান সরকারের উপর বর্তাবে। শোনা যাচ্ছে, ভুল লিগাসির (পরম্পরা) মাধ্যমে অনেক অনুপ্রবেশকারী নাম তুলেছে। তবে একথা ঠিক এন আর সি চালু হওয়ায় বহিরাগত যে মুসলমান সম্প্রদায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাদের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আক্রমণাত্মক নয়। এমনকী, মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন AIUDF এবং ছাত্র সংগঠন AAMSU এই রিপোর্টে সন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

এন আর সি থেকে নাম বাদ যাওয়া বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ বাংলাদেশের ভিটে-মাটি মুসলমান প্রভাবশালী এবং দালালদের দখলে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করেন ওরা বাংলাদেশের নাগরিক। আর বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশের ঘটনা বাংলাদেশ একদম মানবে না। অথচ অসমের ২৭টি জেলার মধ্যে সীমান্তের ৯টি জেলা ইতিমধ্যেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১৮-র জুলাইয়ের রিপোর্ট প্রকাশের পরে এক প্রতিবেদনে বলেছিলাম— বাদ পড়া নাম হয়তো ৪০ লক্ষ থেকে ৯-১০ লক্ষে দাঁড়াবে, আজকের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে আমার অনুমান সত্য হতে চলেছে। সংখ্যাটি যতই হোক, একথা ঠিক বাংলাদেশ একজন মানুষকেও ফিরিয়ে নেবে না। সুতরাং সর্বশেষ বাছাইয়ের পরে বাদ পড়া মানুষজনকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে হয় অসম বা অন্য কোথাও পুনর্বাসিত করতে হবে। কেননা বিদেশিদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যায় না। এমনিতেই অনুপ্রবেশের কারণে জনবিন্যাস (Demographic balance) প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবে সরকার। নিদেনপক্ষে, ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢোকার আগে যাতে দু'বার ভাবে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের অন্য রাজ্যেও এন আর সি চালু করার দাবি উঠেছে। একথা ঠিক, দেশের নানা প্রান্তে অনুপ্রবেশ একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন শৃঙ্খলার অবনতির পিছনে অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীরা জড়িত রয়েছে বলে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা মত প্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায়, দেশ বিরোধী শক্তিকে কিছুতেই উৎসাহিত করা যায় না। বলে অন্য রাজ্যে এন আর সি চালু করার ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি নিলেই ভালো— অসমের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের ভারতে আশ্রয় দানের ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সরকারি ঘোষণা মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগে, পশ্চিমবঙ্গের মতো স্পর্শকাতর রাজ্যে এন আর সি নিয়ে বাড়াবাড়ি হিতে বিপরীত হতে পারে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

বালুচিস্তান বারুদের স্তূপে
যে কোনো সময় ফেটে পড়তে পারে

আন্তর্জাতিক

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

প্রায় ৩৪৭১৯০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে পাকিস্তানের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বালুচিস্তান প্রদেশ, পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের অন্যতম। এর জনসংখ্যা ১ কোটি ২৩ লক্ষ, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ যদিও আয়তনে এটা পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ, প্রায় ৪৩ শতাংশ। এর আছে অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ আর পাকিস্তানের বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় সবটাই এখানে। পারস্য উপসাগরের তেলকূপের এলাকায় এর অবস্থান, ঠিক যেখানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান মিশেছে সেই ত্রিভুজের মুখে। সেই কারণে ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে এটা পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাকিস্তানের সমগ্র উপকূল অঞ্চলের বেশিরভাগই এর মধ্যে পড়ে— আরব সাগরের প্রায় ৪৭০ মাইল।

সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা স্বেচ্ছাচারীভাবে এই জায়গাটা চালায়। ঐতিহাসিকভাবে এটা ছিল বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর একটা আলগা সংগঠন। ইতিহাসের নানা সময়ে তারা কখনো পারস্য সম্রাটের অধীনে কখনো বা আফগানিস্তানের রাজার অধীনে অতিবাহিত করেছে। এর মূল জাতিসত্তা পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশের থেকে স্বতন্ত্র। বেশিরভাগ সময়ে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তারা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন এমনকী স্বাধীন রাষ্ট্রও দাবি করে এসেছে যেখানে তারা পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৫০ লক্ষ বালুচিকে একত্রিত করবে। পাকিস্তান নিজে জানে যে এর সামাজিক- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পড়শী দেশগুলোর পক্ষে এখানে ঢুকে পড়া সুবিধাজনক। তাই বালুচিস্তান পাকিস্তানের পক্ষে একটা কাঁটাস্বরূপ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের সঙ্গে অবিভক্ত ভারতের ৫৩৫টা করদ রাজ্যকে তিনটে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল— নিজ নিজ এলাকা জুড়ে দিয়ে ভারতে বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দাও অথবা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাক। বালুচিস্তানের বেশিরভাগ অংশ ছিল কালাতের মধ্যে। কালাত হচ্ছে এখনকার বালুচিস্তান প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত একটা করদ রাজ্য। এর অস্তিত্ব ছিল ১৬৬৬ সাল থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত। কালাতের শাসক খান সাহেব স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল, ভারত বা পাকিস্তান কারো সঙ্গে জুড়তে অস্বীকার করেছিল। আর বালুচিরা জন্মগতভাবে স্বাধীনচেতা; তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সত্তা আছে।

জিন্নাহ-শাসিত পাকিস্তান জোর করে বালুচিস্তানকে পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ বানায়; বালুচিদের ও তাদের শাসকের এতে একেবারেই সায় ছিল না। কালাতের সংযুক্তিকরণের পর থেকে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে বালুচিস্তানের সংগ্রাম চলছে। বিশ্বের অন্য দেশসমূহ বিশেষত ভারত, ইরান ও ইউএসএ বালুচিদের সাহায্য না করলে পাকিস্তান সেখানে আবার গণহত্যা চালবে। বালুচিস্তান ইউএস ও ভারতের কাছে দরবার করেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৌখিক আশ্বাস ছাড়া কিছু মেলেনি।

স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের ১৮শো সংবিধান সংশোধনীতে বালুচিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে নেহরু রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারকে মাত্র কিছু ফেডারেল ক্ষমতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল বাকি সব থাকবে প্রদেশের হাতে। কিন্তু জিন্নাহ তাতে অরাজি হয়ে ১৪ দফা যে প্রস্তাব দেন,

তাতেও বালুচিস্তানকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু এর পরেও পাকিস্তানের সংবিধানে প্রতিশ্রুত এই অধিকারের বিরুদ্ধে গিয়ে 'পাকিস্তান বাঁচাও' অজুহাত তুলে অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করে বালুচিস্তানের ক্ষেত্রে কুখ্যাত 'হত্যা কর ও গায়েব করে দাও' নীতি চালু হয়। পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এর নিন্দা করেছে, এমনকী বালুচিস্তানের ফেডারেল সরকার বা সংসদীয় রাজনীতির সমর্থকগণও এর বিরুদ্ধে গেছে, যেমন বালুচ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি), বিএনপি মেঙ্গাল, আওয়ামি প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক শোষণ : প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, তামা, সালফার, ফ্লোরাইড ও সোনার মতো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল; অথচ এটাই পাকিস্তানের সবচেয়ে অনুন্নত প্রদেশ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বালুচিস্তান প্রদেশের সঙ্গে কোনো শলাপরামর্শ করে না। তারা বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি করে প্রাদেশিক সরকারের মত না নিয়ে, খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন করে, কোনো কিছু জানায় না। সাইন্ডাক গোল্ড অ্যান্ড কপার প্রজেক্ট (সোনা ও তামা প্রকল্প) একটা মোক্ষম উদাহরণ। বালুচিস্তানকে এর মাত্র ২ শতাংশ শেয়ার দেওয়া হয়। বালুচিস্তানের সুই গ্যাস প্রকল্পের থেকে কোনো বকেয়া রয়্যাল্টি দেওয়া হয়নি, যার পরিমাণ ৩০০০০ কোটি পাকিস্তানি রুপি। শুধু তাই নয় গ্যাসে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রদেশের ২৯টা জেলায় কোনো গ্যাস সরবরাহ নেই।

এই প্রদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বললেই হয়। যে কোনোরকম বিক্ষোভকে ক্রূর, কঠোর হাতে দমন করা হয়। এমনকী অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করায় নাবালক ছাত্রদেরও রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো হয়েছে। প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্পদ থাকলেও এখানে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম। 'চায়না পাকিস্তান ইকনমিক করিডর' (সিপিইসি)-এর জন্য বাধ্য হয়ে গোয়াদর বন্দরকে 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চল, তকমা দেওয়া হয়েছে; এর মানে এই নয় যে এখানে কোনো উন্নতিবিধান করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি করা সিপিইসি-র লক্ষ্য নয়। বরং সেটা করা হয়েছে মাকরানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। মাকরান হচ্ছে ওমান উপসাগরের তীরবর্তী পাকিস্তানের বালুচিস্তানে এবং ইরানে অবস্থিত একটা সরু প্রায় মরুভূমি অঞ্চল। মাকরান অঞ্চলের বাইরে একটাও কোনো রাস্তা তৈরি হয়নি। সন্দেহ করা হয় যে ১৯৩ কিলোমিটার লম্বা এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে মাকরানের দুর্গম অঞ্চলে যাওয়ার পথ সুগম করার জন্য। আগে এখানে কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না। আর সেখানে ছিল বিদ্রোহের উর্বর ক্ষেত্র, বিশেষ করে এর আওয়ারান এলাকা। এই পথ নির্মাণ করা হয়েছে সামরিক অভিযান চালানোর সুবিধার জন্য। তাই বালুচিস্তানের লোকে এটাকে খারাপ চোখেই দেখে।

বালুচিস্তানে উন্নতির নাম করে শোষণ করা হয়। ইসলামাবাদ- বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারোপ করে যে তাদের উন্নতি মানে রাস্তা-নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশন করা ও সামরিক ছাউনি তৈরি করা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতাল নির্মাণ নয়। মুশারফের আমলে ৮ বছরে মাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাও সুবিধাবাদী জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা। সব থেকে খারাপ ব্যাপার হলো জিনজন বাদে জনজাতি প্রধানদের সবাই নিজ স্বার্থে সরকারি যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে জনগণের সর্বনাশ করে, যেমন মাগসি, রিন্দ, জাম, জামালি, জেহরি এরা। ভোটে তাদের নির্বাচন করা হয় না, সরকারের পছন্দ মতো লোক বসিয়ে দেওয়া হয়। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী। মনে করা হয় যে বালুচরা সংখ্যায় অল্প আর অশিক্ষিত, কিছু করতে পারবে না।

গেরিলা যুদ্ধ : বালুচ জাতীয়তাবাদীরা পাকিস্তানের দক্ষিণ- পশ্চিমে বালুচিস্তান প্রদেশে, ইরানের দক্ষিণ-পূর্বে সিস্তান ও বালুচিস্তান প্রদেশে ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের বালুচিস্তান অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালায়। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এই প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে অধিক স্বত্ব দাবি করে। বালুচ দেশপ্রেমিকরা এই প্রদেশে অন্য জাতিগোষ্ঠীর অসামরিক আধিকারিকদের উপরে আক্রমণ চালায়। ২০১০-এর দশকে বালুচ গেরিলারা শিয়াদের আক্রমণ করেছিল। এর আগে ১৯৪৮, ১৯৫৮-৫৯, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৭৩-৭৭ পর্বে বালুচ জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ২০০৩ সালেও আরও শক্তিশালী, বিস্তৃত বিদ্রোহ চালানো হয়েছে। বালুচ লিবারেশন অর্গানাইজেশন ২০০০ সাল থেকে পাকিস্তানি সেনা, পুলিশ ও অসামরিক অফিসারদের উপরে সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। অন্য সংগঠনের মধ্যে আছে লস্কর-ই-বালুচিস্তান ও বালুচ লিবারেশন ইউনাইটেড ফ্রন্ট। ২০০৫ সালে ইসলামিক রিপাব্লিক অব ইরানের সিস্তান-ই-বালুচিস্তানে সেখানকার মাত্র ২ শতাংশ বালুচরা বিদ্রোহ ঘটায়। তবে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। ২০১৬ সালের আগস্টে চারজন সামরিক কম্যান্ডার বিদ্রোহীকে খতম করা হয় ও ১০২৫ জন আত্মসমর্পণ করে ২০১৭-র এপ্রিলে আরও ৫০০ জন আত্মসমর্পণ করে।বালুচিস্তানের পাশতুন জনগণের মাত্র ১২ শতাংশ আর বালুচদের ৩৭ শতাংশ মাত্র স্বাধীনত চায়। তবে বালুচিস্তানের ৬৭ শতাংশ বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন চায়। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও কার্যত কিছুই করেনি। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে বিদ্রোহ নিবে গেছে। ক্ষোভের আগুন জ্বলছে যে কোনো সময়ে তা ফেটে পড়তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পারমাণবিক শক্তিধর হলেও পাকিস্তান রেহাই পাবে না। ইউগোশ্লাভিয়া পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হয়েও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন ইসলামাবাদ সামরিক ও অসামরিক উভয় দিক থেকে তার বালুচিস্তান নীতি বদল করলেও পাকিস্তানের তাঁবে হয়ে থাকতে তারা নারাজ। তাদের চোখে, মনে ও মুখে একটি ভাষা— স্বাধীন বালুচিস্তান।

‘রাম কে নাম’ তথ্যচিত্রের উদ্দেশ্য হিন্দু ইতিহাসের বিকৃতি

সুমন চন্দ্র দাস

‘রাম কে নাম’ তথ্যচিত্রটির নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধন। তথ্যচিত্রটি ১৯৯২ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায়। এটির বিষয়বস্তু অযোধ্যার রাম জন্মভূমি এবং রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গ এবং মুসলমান তোষণ। ঐতিহাসিক ভাবে তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তুর ইতিহাস শুরু হয় ১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবরের বাবরি ধাঁচা নির্মাণের সময় থেকে। তথ্যচিত্রটি মূলত হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় নির্মিত। কোনো বিশেষ কাহিনি নেই, সবটাই ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাৎকার। এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভাষণের বিষয়বস্তুকে আধার করে রামজন্মভূমি ও মন্দির নির্মাণ একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হিংসাত্মক আন্দোলন এবং এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ নির্মাণ করেছে— এমন একটি বার্তা দিয়ে তথ্যচিত্রে মূলত রাম জন্মভূমি পুনরুত্থান আন্দোলনের বিপক্ষে তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়েছে। এই ‘রাম কে নাম’ তথ্যচিত্রটিতে পটবর্ধন স্বধর্ম স্বদেশ বিদ্বেষী বামপন্থী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমান তোষণের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবেশন করেন এবং তা তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ‘সেরা ডকুমেন্টারি’ হিসাবে পুরস্কার দেয়। খুব কৌশল করে ভারতীয় হিন্দু রামভক্তদের ধর্মীয় ভাবাবেগের উপর চরম আঘাত হানে এই তথ্যচিত্র। এবং তৎকালীন সরকার কৌশল করে রাম মন্দির আন্দোলনের বিপক্ষে জনমত তৈরিতে এই ধরনের তথ্যচিত্র নির্মাণে আর্থিক জোগান দেয় বলে অনেকে মনে করেন। তথ্যচিত্রের বিষয়ে লালুপ্রসাদ যাদবকে বলতে শোনা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রথযাত্রা এবং রামভক্তদের করসেবা গণআন্দোলনকে কোনো রকম ভাবে বরদাস্ত করা হবে না। কারণ লালুর জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) হিন্দু সংস্কৃতি-ধর্মের পুনরুত্থান এবং রামমন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লালু বর্তমানে জেল খাটছেন।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানীর রথযাত্রা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক যাত্রা। একটাই দাবি ছিল রাম মন্দির রামের জন্মস্থানেই হবে। রামের

জন্মস্থান ও সময় নির্ণয়ে কোর্টের মতামত দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। কেবলমাত্র জমি বিবাদের রায় ন্যায়ালয়ে অপেক্ষমান। বিদেশি মুঘল শাসক রামমন্দির ভেঙ্গে বাবরি ধাঁচা তৈরি করলে সেই মন্দির পুনরুদ্ধারে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলো প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দুর আত্ম-অহংকার এবং স্বাভিমানের অধিকার। রাম জন্মভূমি পুনরুদ্ধার এবং মন্দির পুনর্নির্মাণের মধ্যে ভারতীয়দের আস্থা ও বিশ্বাস আছে গভীর ভাবে। তাতে নেতৃত্ব দিয়ে বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তথ্যচিত্রে দেখানো হয় সেই সময় পাটনায় মুসলমান তোষণকারী সিপিআই সমর্থকরা বার বার বলেন রাম মন্দিরের আন্দোলন হিন্দু উগ্রবাদীদের আন্দোলন। তাদের মতে মন্দির নির্মাণ হলে মুসলমান সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হবে তাই মন্দির অযোধ্যার রাম জন্মস্থলে নয় অন্যত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্ন করি ধর্মনিরপেক্ষ বাপন্থীদের, রামায়ণ ও রামকে যারা উৎখাত করে নিজেদের ধর্মীয় নিশান প্রতিষ্ঠা করল তাদের যারা এই প্রশ্ন করেন না তারা কি আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ? সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ মুসলমান শাসকের কলঙ্ক বহন করবে না। এছাড়াও হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণবৈষম্য, জাতি বৈষম্য, দলিত ভাবনা দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু জাগরণের মঞ্চকে বিভ্রান্ত করে হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য গরম গরম বক্তৃতার অংশ তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়। এই তথ্যচিত্র প্রদর্শন করলে রাম জন্মভূমি জমি বিবাদের শুনানিকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করি যে তথ্যচিত্রে ক্ষত্রিয় অড়োরা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নিজেকে জাতপাতের ঊর্ধ্বে রেখে সাধারণ হিন্দু বলে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, বাবরি ধাঁচা ভারতের কলঙ্ক, এই কলঙ্ককে সমাজবাদী নেতা মুলায়ম সিংহ যাদব নিজের মাথায় রাখুন, কোনও ভারতীয় মাথায় বহন করবে না, এই কলঙ্ককে মুছে দেবে। তথ্যচিত্রে উঠে আসে গান্ধীজী ও নাথুরাম গডসের কথা। কংগ্রেস সরকার সত্তর কোটি হিন্দুর কথা ভুলে দশ কোটি মুসলমানের জন্য তোষণের রাজনীতি করেছেন যা নিন্দনীয়।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ হলো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ আর পাকিস্তান- বাংলাদেশ হলো মুসলমান দেশ। দেশভাগের সময় হিন্দুদের আশ্রয় একটাই ছিল তা হলো

ভারতবর্ষ আর মুসলমানদের ভারত এবং পাকিস্তান দুটো দেশ ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ দুই তিন প্রজন্ম আগে হিন্দু ছিলেন। সমস্ত মুসলমান আরবদেশ থেকে পায়ে হেঁটে আসেননি। ভারতবর্ষে বহিরাগত মুসলমান শাসক পরিকল্পনা করে হিন্দু নারীদের ধর্ষণ বা বিবাহ করে 'দারুল হারব'কে 'দারুল ইসলাম' করে। মুঘল মুসলমান শাসকদের ভারত আক্রমণ ছিল ধর্মীয় লড়াই। একদিনে সবটা হয়নি ধীরে ধীরে হয়েছে। এই রাম মন্দিরের লড়াই ধর্মীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে এবং আত্মবিস্মৃত হিন্দু জাতির সংস্কৃতির লড়াই। জোর করে অত্যাচার করে ভয় দেখিয়ে খুন করে ধর্ষণ করে বিদেশি মুসলমানের বীজ এই দেশীয় পিছিয়ে পড়া সমাজের হিন্দুদের মধ্যে বপন করে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করেছে। ঐতিহাসিক ভাবে এই কথা সত্য। এই আন্দোলন ধর্মীয় ভাবে মুসলমান ধর্মের আগ্রাসী ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে লড়াই তাই তো আন্দোলনের ভাষা ''ইয়ে তো পহলা ঝাঁকি হ্যায়, কাশী মথুরা বাকী হ্যায়''। এক এক করে সমস্ত হিন্দু ধর্মস্থল মন্দির-স্থাপত্য-বিহারকে মুসলমান ধর্মীয় সন্ত্রাস ও সংস্কৃতির পরাধীনতার কলঙ্ক থেকে মুক্তির লড়াই।

উল্লেখ্য বাবর নির্মিত বাবরি ধাঁচার নীচে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল এই কথা এলাহাবাদ হাইকোর্ট মেনে নিয়েছে। সেই সঙ্গে বলে রাখি ২০১৯ আগস্টের ৬ তারিখ থেকে শুনানিতে রামজন্মভূমি পুনরুত্থান সমিতির পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী পি এন মিশ্র শাহজাহান ফরমান শরিয়তি আইনের পক্ষে বলেন মসজিদ মসজিদের সম্মান তখনই পাবে যখন তা আল্লাহের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দানকৃত ভূমির উপর নির্মিত হবে। কিন্তু বাবরি ধাঁচার নীচে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলে এটাই স্পষ্ট হয় উক্ত ভূমি আল্লাহের উদ্দেশ্যে দান করা নয়। মসজিদ তকমায় শরিয়তি বিধানে বাবরি ধাঁচা মান্যতা পায় না— এই রকম যুক্তিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্ন হলো রামজন্মভূমির মালিকাধীন স্বত্ব কার? রামজন্মভূমি ও মন্দির নিয়ে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে মামলা বললেও বিচারের বিষয় জমিবিবাদ এবং জমির মালিকানাস্বত্ব কার? জন্মভূমি-মন্দির নিয়ে কোনো সংশয় নেই মালিকানা স্বত্ব নিয়ে প্রশ্ন। বিবাদমান বিষয় ২.৭৭ একর জমির মালিক কে? কিন্তু তথ্যচিত্রের বিষয়, মন্দির আন্দোলন প্রাসঙ্গিক কি না? হ্যাঁ অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। মুঘল সম্রাট বাবর সমরকন্দ থেকে এসে ভারতবর্ষ দখল করে এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক বাহক রাম ভক্তিবাদকৃষ্টির মন্দির ভেঙ্গে ধাঁচা নির্মাণ করে শরিয়তি ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমদেশ থেকে আগত ধর্মীয় জেহাদের শিকার হয় ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতির স্থাপত্য ভাস্কর্যকে ধ্বংস করে সেই ভাঙা ইমারত দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কথা মুসলমান ঐতিহাসকরাই লিখে গেছেন। বাবরের মসজিদ রামজন্মভূমি এবং মন্দিরের উপর অবৈধ নির্মাণ। হিন্দু সংস্কৃতির উপর বর্বর আক্রমণ।

গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক ভাবে বাক্ স্বাধীনতার অধিকার অবশ্যই থাকবে কিন্তু কোন সময়ে কী মত প্রকাশ করা যাবে তার একটা নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। ১৯ আগস্ট হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে আইসা (AISA) সমর্থিত অতিবাম ছাত্র সংগঠন এই 'রাম কা নাম' প্রদর্শনের ব্যাবস্থা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি এবং পরে পুলিশ এসে প্রদর্শন বন্ধ করে ৪ জন আইসা (AISA) সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। অনুরূপ ভাবে বিতর্কিত তথ্যচিত্রটিকে প্রদর্শন করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনের অনুমতি দেয়নি। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুপ্রেরণায় ফিল্ম স্টাডি বিভাগের সহযোগিতায় আইসা (AISA) ও অতিবাম (USDF, SFI, REDICAL) সমর্থিত কিছু ছাত্র বাইরের আর্থিক সহযোগে বিভাগের পাঠকক্ষে নয় প্রকাশ্য ভাবে সুবর্ণজয়ন্তী ভবনের সামনে জনসমক্ষে মুক্ত রাস্তার উপর ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্টকারী 'রাম কা নাম' প্রদর্শন করে এবং হিন্দু আস্থার পরিপন্থী সূচক ধ্বনি দিয়ে রামের জন্মস্থান এবং মন্দিরের বিরুদ্ধে প্রচার চলায়। হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় আস্থাতে গভীর আঘাত করা এবং মুসলমান সমাজকে উৎসাহিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য এই তথ্যচিত্রের। এই প্রদর্শন অবশ্যই রাম জন্মভূমি ও রাম মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে সুপ্রিমকোর্টের রায়কে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে উদ্দেশ্য মূলক রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য 'রাম কা নাম' তথ্যচিত্র প্রদর্শনের অনুমতি বিশেষ শুনানিকে প্রভাবিত করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত উপাচার্য, নিবন্ধক, ফিল্ম স্টাডি বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই প্রদর্শনের বিরুদ্ধে যাদবপুরের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, কর্মচারী পরিষদের একাংশ তীব্র বিরোধিতা করে এবং অবস্থান বিক্ষোভ প্রকাশ করে। কর্তৃপক্ষ তথ্যচিত্র প্রদর্শনের অনুমতি নিয়ে অস্বীকার করলেও পরে বিপক্ষ ছাত্রদের অবস্থানে অনুমতির চিঠির প্রতিলিপি দিতে বাধ্য হয়। আইনের সঠিক অনুশাসন ও মান্যতার বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতটা মান্যতা দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আমি মনে করি বিশেষ ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে মতামত চাপিয়ে দিতে চাইছে এবং এটা রাজনৈতিক ভাবে রাজ্য তৃণমূল সরকারের অঙ্গুলি নির্দেশ। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যসরকার ব্যবহার করছে যা উচিত নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি সুপ্রিমকোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে বাক্স্বাধীনতা, মত প্রকাশের নামে বিচারাধীন বিষয়ে 'ল অ্যান্ড অর্ডার'কে অমান্য করছেন না? নাকি সুপ্রিমকোর্টের উর্ধ্বে স্বশাসিত এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়? অনেক প্রশ্ন। যদি বিচারাধীন বিষয়ে বিশেষ ধর্মের মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ, দেবতার মন্দির, রামজন্মভূমি ও মন্দিরের বিপক্ষে ধর্মীয় আঘাতের অনুমতি 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন' বলে সঠিক বলে মনে হয় তাহলে কী সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশের পর রায় রামমন্দিরের পক্ষে হলে জয়সূচক উল্লাস মেনে নেবে? এবং বিপক্ষে হলে উপযুক্ত আন্দোলনের 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন' কি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে মেনে নেবেন? নাকি ধর্মীয় সম্প্রীতির অজুহাতে কঠোর হাতে দমন করবেন বাক্স্বাধীনতাকে? প্রশ্ন থেকেই যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কিত তথ্যচিত্র দেখানোর অনুমতি দিয়ে এই ভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার প্রচেষ্টা এবং বিচারাধীন বিষয়ে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা সমাজের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়। ■

মিথ্যা প্রচারের শিকার দেশের অর্থনীতি

পবন চৌধুরী

কিছুদিন ধরে কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএম নেতারা দেশজুড়ে একটা প্রচার চালাচ্ছেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নাকি তীব্র সংকটে। এমন ঢঙে এই প্রচার চালানো হচ্ছে যেন আজকালের মধ্যেই দেশের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমরেডদের ছানাপোনারা বিকৃতভাবে কার্টুন সহযোগে আগামীদিনে দেশের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একশ্রেণীর মিডিয়া বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রগুলো দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা তথ্য সহযোগে আতঙ্ক সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। একটি পত্রিকা সম্প্রতি তাদের প্রথম পাতায় এমন সংবাদও করেছে সরকার নাকি টাকার দাম বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে পড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে জরুরি সভা তলব করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী আরও সরেস। বলেই বসলেন দেশ আবার পরাধীন হতে চলেছে। এহেন প্রচারের অন্যতম কারণ কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবনীয় সাফল্যের দিক থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া। আর সেই দৃষ্টি ঘোরানোর কাজে তারা হাতিয়ার করেছেন অর্থনৈতিক সংকটকে। এমনভাবে প্রচার চলছে যেন ভারতের অবস্থা ভেনেজুয়েলার থেকেও খারাপ হতে চলেছে। পরপর ঘটমান দুটি বিষয়কে বিকৃত করে সাধারণ মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

প্রথম বিষয়টি বিদেশি মুদ্রার সাপেক্ষে টাকার মূল্য হ্রাস। যারা সমালোচনা করছেন তারা ভালোমতো জানেন এই মূল্যহ্রাস আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য যুদ্ধের অঙ্গ। বিশ্ববাজারে উৎপাদনশীল দেশগুলো কেউ এই মুহূর্তে কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নয়। প্রতিটি দেশই চাইছে তার দেশের বাজারে বিদেশি পণ্যের থেকে স্বদেশি পণ্যের বিক্রি বাড়ুক। দেশীয় বাজারে বৃদ্ধি পাক বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে বিদেশি লগ্নি। পাশাপাশি বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় হোক তাদের পণ্য। আর তা যদি সফল করে তুলতে হয়, অবশ্যই আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়াতে হবে। ভারত ডব্লিউটিও-র অন্যতম সদস্য। যে চুক্তিপত্রে ভারত স্বাক্ষর করেছে তা অবমাননা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা তার আর নেই। অতএব একটাই পথ খোলা। বিদেশি পণ্যের মূল্য স্বদেশি বাজারে বাড়িয়ে দেওয়া। আর স্বদেশি পণ্যের মূল্য বিদেশি বাজারে কমিয়ে দেওয়া। একমাত্র মুদ্রার মূল্য হ্রাসই যা সফল করে তুলতে পারে। এতে আমদানি করা গহনার সোনা বা পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং পাচ্ছেও। শেয়ার বাজারে সাময়িক পতন হবে এবং হচ্ছেও। কিন্তু বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের বাজার থেকে তাদের মুনাফা তুলতে পারবে না। পক্ষান্তরে মুনাফা বাড়াতে গেলে লগ্নি তাদের বাড়াতেই হবে ভারতের বাজারে। এর কোনোটিতেই সরাসরি সাধারণ মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না। অথচ এগুলোকে বিকৃত করেই কংগ্রেস আর সিপিএম প্রচারে নেমেছে দেশের অর্থনীতি গেল গেল। একবারও তারা প্রকৃত ঘটনা বলছেন না।

তাদের এই প্রচারে আরও একটি বিষয় তারা যোগ করেছে। সেটি হলো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সরকারের প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার সাহায্য নেওয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সরকার টাকা নিয়েছে। অতএব এই সুযোগে জোরদার প্রচার লাগাও ভারতের অর্থনীতির হাল খারাপ। কিন্তু বিজেপি সরকার কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিল? নিশ্চয়ই সরকারের এই মুহূর্তে বাজেট বহির্ভূত বিশাল খরচের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাশ্মীরের পুনর্গঠনের জন্য সরকারি বিনিয়োগেই তো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

কাশ্মীরে গত ৭২ বছর ধরে দেশের টাকা নয়ছয় হয়েছে। কেনও উন্নয়নশীল কাজ সেই রাজ্য সরকার সেখানে করেনি। পক্ষান্তরে রাজ্য নেতারা তাদের অগাধ সম্পত্তি বাড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়েছে। রাজ্যের যুব সম্প্রদায়কে কোনও দিশা দেখাতে তো পারেইনি উপরন্তু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের খপ্পরে। তাই তৈরি হয়েছিল পাথরবাজের দল। সেনার উপর পাথর ছুঁড়েই তারা আয় করছিল। এই কাশ্মীরের আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এখন আর ৩৭০ ধারা নেই। কাশ্মীরে নতুন করে পরিকাঠামো গঠনের প্রয়োজন। বিনিয়োগের পথ সুগম করতে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের। এই উন্নয়নের কাজ শুরু হলেই কাশ্মীর উপত্যকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে। তারাও মিলিত হবে দেশের মূলস্রোতে। সরকারের এই মুহূর্তে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে চাই বিপুল অর্থ। যা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে মোদী সরকার নেবে না। কারণ বিশ্বের প্রথম সারির দেশে আজ ভারতের অবস্থান দীর্ঘ ছ'বছর বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারস্থ না হবার কারণেই। তাই সরকার নিজের সম্পদ ব্যবহার করে এই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কংগ্রেসের এবং সিপিএম নেতারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই বিষয় সম্বন্ধে অবগত। তবুও নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে তারা সম্পূর্ণ বিকৃত প্রচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

দেশের অর্থনীতি যখন সঙ্কটে পড়ে, তার সর্বপ্রথম প্রভাব পড়ে দেশীয় বাজারে। ভারতের দেশীয় বাজার তো অনেক বেশি স্থিতিশীল। চড়া মূল্যবৃদ্ধির কোনও গল্প নেই। সামাজিক প্রকল্পের জন্য অর্থের কোনও ঘাটতি নেই। দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে রেলের ভাড়া না বাড়লেও রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন থেমে নেই। গ্রামে গ্রামে সড়ক যোজনার কাজ এগিয়ে চলেছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনে গরিব মানুষের শৌচাগার নির্মাণ তড়িৎ গতিতে চলছে। গরিব মানুষের গৃহ নির্মাণের টাকা সরকার দিয়ে চলেছে। মিড ডে মিল সারাদেশের কোথাও বন্ধ নেই। কোনও রাজ্যে ডিম ভাতের বদলে নুন ভাত খাইয়ে টাকা লুটপাট হলে তার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তায় না। কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ে কর বর্তমানের ২০ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ করার সুপারিশ এসেছে। অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনায় গরিব মানুষকে দু'টাকা কেজিতে চাল গম সরবরাহও থেমে নেই। সঙ্গে সঙ্গে থেমে নেই কংগ্রেস আর সিপিএমের মিথ্যা প্রচার। ■

আমেরিকায় বসবাসকারী আত্মানুসন্ধানে ব্রতী তরুণ প্রজন্মের মনের কথা

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন তাদের বার্ষিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী উদ্ধৃত করে। তরুণ প্রজন্মের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে কীভাবে এই বাণী তাদের হিন্দু আমেরিকান হতে অনুপ্রাণিত করেছে। উদ্ধৃতিটি হলো :

"The intemest love that humanity has ever known has come from religioun, and the most diabolical hatred that humanity has known has also come from religion. Nothing makes us so cruel as religion, and nothing makes us so tender as religion."

তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া যায়। তারা তাদের মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছে তাদের রচনায়।

উদাহরণ স্বরূপ, টেক্সাসের কলেজ স্টেশনের হাই স্কুল ছাত্রী অন্তরা দত্তগুপ্তের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের একনিষ্ঠ সমর্থক অন্তরা তার গুরুজী অনু সমুগমের কাছ থেকেই আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করেছে। তার বয়স মাত্র সতেরো।

অন্তরা জানিয়েছে যে মাতা, পিতা, গুরুজী এবং দেবতা, এই বিষয়েই তার গুরুজী তাকে অবহিত করেছেন। বাল্যকাল থেকেই এঁদের শ্রদ্ধা করতে সে শিখেছে। প্রতি রবিবার 'বালবিহার' ক্লাসে এবং প্রতি বুধবার 'শ্লোক' ক্লাসে যাওয়ার ফলে হিন্দুত্ব ওর মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। অন্তরার গুরুজী ওকে সর্বদাই বলেন, ''তুমি যা, তার জন্যই গর্ব অনুভব করবে, তুমি একজন হিন্দু হিসেবে গর্বিত থাকবে।"

অন্তরা একটি গোঁড়া খ্রিস্টান শহরে বড়ো হয়েছে, যেখানে প্রতি আধ মাইল অন্তর একটি করে গির্জা রয়েছে। অনেক সময়েই তাকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তার ধর্ম বিশ্বাস তাকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে। স্কুলের ট্যালেন্ট শোয়ে সে যখন কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেছে, তার সহপাঠীদের ভালো লাগেনি, যখন সে তার সহপাঠীদের জানিয়েছে যে সে গোমাংস ভক্ষণ করে না, তখন সহপাঠীরা বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কারণ টেক্সাসের লোকজনদের কাছে গোমাংস একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য। অন্তরা জানিয়েছে যে প্রত্যেকটা বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর সে আরও একাত্ম হয়েছে হিন্দুত্বের সঙ্গে।

অন্তরা দেখেছে কীভাবে ধর্মবিশ্বাস মানুষের পরিবর্তন ঘটায়। তার বাল্যবন্ধুরা, যারা ওর সঙ্গে শ্লোকের ক্লাসে উপস্থিত থাকত, সেখানে যাদের সঙ্গে দেখা হতো, তারা হাইস্কুলের অন্যান্যদের থেকে আলাদা হতে চায় না। তাই তারা এখন নিজেদের নাস্তিক বলে। যখন অন্তরা তাদের এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চেয়েছে, তারা বলেছে যে তারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে চায় না। তখন ওর মনে হয়েছে যে ও সত্যিই ধন্য। কারণ ও অনেক সমমনোভাবাপন্ন বন্ধু পেয়েছে যারা ওর সঙ্গে মন্দিরে যায় হোলি ও দীপাবলী উৎসব পালন করার জন্য। শুধু কি তাই? ওর বাড়িতে দেবী সরস্বতী। ভগবান গণেশ এবং আর অনেক দেব-দেবীর মূর্তি বা ছবি দেখে তারা এই দেবী- দেবতাদের সম্বন্ধে জানতে চায়, আগ্রহ প্রকাশ করে। তার এই বন্ধুদের জন্যই সে অন্যধর্মের অসহিষ্ণুদের কথা ভুলে গেছে।

অন্তরার কথায় ধর্ম যেন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি না করে, অন্যদের যেন অনুপ্রাণিত করে, একে অপরের থেকে অন্য ধর্মের বিষয়ে জানতে পারে।

অন্তরাদের স্কুলে বিশ্ব ধর্মগুলির উপরে ক্লাস হয়, যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে জানতে পারে। সে লক্ষ্য করেছে যে, এক সপ্তাহ খ্রিস্টধর্মের উপর ধার্য, চারদিন ইসলামের উপর, তিনদিন জুডাইসম্-এর এবং বৌদ্ধধর্মের উপর, আর মাত্র একটি দিন হিন্দু ধর্মের জন্য বরাদ্দ। ওই একটি মাত্র দিনটিতেও অন্তরা লক্ষ্য করল যে ৫০ মিনিটের একটি ভিডিও দেখানো হলো যেখানে শুধুই ভারতের কাস্ট সিস্টেমের কথা বলা হলো। এটা দেখে অন্য ধর্মের লোকজন হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কী জানতে পারবে? সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য হিন্দু আছেন যারা জাতপাত মানেন না। এই ভিডিওটি দেখে যদি কেউ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা প্রাপ্ত হয় তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি?

এরপর অন্তরা তার শিক্ষিকাকে অনুরোধ জানায় যেন হিন্দু ধর্মের জন্য আরেকটি দিন বরাদ্দ করা হয়। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার। অন্তরাকে অবাক করে তিনি পরদিনই ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রজেক্ট করতে দিলেন যেখানে প্রাচীন ভারতের আবিষ্কারগুলির উপর আলোকপাত করতে হবে। অন্তরা তখন হিন্দুদের আবিষ্কারগুলি অন্তরের ও বাহিরের, উপস্থাপিত করল নিজের সাধ্য অনুযায়ী, ওই প্রজেক্টের মাধ্যমে। সে তার ক্লাসের বন্ধুদের হিন্দু ধর্মের কর্ম, ধর্ম, পুনর্জন্ম ও মোক্ষ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত করাতে পারল।

অন্তরা জানিয়েছে যে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতিটি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, প্রকৃত হিন্দুত্ব সম্বন্ধে চর্চা করে মানুষকে জানানো, হিন্দুত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি দূর করা সে তার কর্তব্য বলে মনে করে। কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন সংগঠনের যেমন Brazos Vally World Fest ও CRY India (Child Right and You) ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নৃত্যপ্রদর্শনের মাধ্যমে অন্তরা নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি বহু মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ❙

চন্দ্রযান-২

চন্দ্রের দক্ষিণ মেরুতে বিক্রমের ল্যান্ড করার বিষয়ে শুধু ভারত নয় সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী উদ্দীপনা ও আগ্রহ ছিল। আসলে গবেষণার ফল এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। সুদূর প্রসারী উন্নত কারিগরি বিদ্যা, জীবদদায়ী ওষুধ, ইন্টারনেট-সহ যে কোনো বিষয়ে কেবল আবিষ্কারক দেশেই ব্যবহৃত হয় না, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এর সুফল ভোগ করে। তাই ল্যান্ডার বিক্রম ১০০ ভাগ সফল না হওয়ায় সকল দেশের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিগণ ভারতীয়দের মতোই কিছুটা আশাহত। আসলে সুশিক্ষিত ও মানবতাবাদীদের একই চিন্তা ভাবনা, অথচ পাকিস্তানীদের এরূপ মনোভাব নেই বা খুবই কম তাই সাধারণ ব্যক্তি থেকে সেদেশের মন্ত্রী পর্যন্ত এই ঘটনায় উল্লাস ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেছে। আসলে এটাই এদের কালচার। মনে পড়ল এক গোঁয়ার প্রাণীর স্বভাব, প্রকৃতিতে এরা সহজলভ্য খাদ্য থাকা সত্ত্বেও আবর্জনা ঘেঁটে নোংরা খাদ্য খায়। আর সারা দেহে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা মেখে থাকতে পছন্দ করে। আসলে যার যেটা অভিরুচি।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলী।

নেতা নয় দলের সম্পদ কর্মীরাই

সম্প্রতি লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পরে এই রাজ্যের তৃণমূল নেতাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দিল্লি গিয়ে এই নেতারা যোগদান করছেন। খুব ভালো কথা এতে দলের সদস্য বাড়ছে। কিন্তু তাঁরা কি নেতৃত্ব দিয়ে সবাই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? যেমন মনিরুলবাবু আগে এসেছিলেন, জানি না তিনি কতটা দলের ভোট বাড়তে পারতেন! সম্প্রতি দুজনের খবর খুব শোনা যাচ্ছে— একজন কলকাতার প্রাক্তন মহানগরিক ও তাঁর বন্ধু। তাঁরা শুনছি নাকি দল আবার ত্যাগ করবেন। যারা কিছু কাজ শুরু না করেই দল ছাড়ার কথা ভাবেন তাদের আটকে রাখার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করার কোনো যুক্তি আছে? অন্য দলে কেউ নেতা হতে পারেন, কিন্তু নতুন দলে কিন্তু শূন্য থেকে শুরু করে নিজের জায়গা করে নিতে হয়, না হলে সেই দলের উত্থান যত দ্রুত হয় পতনও তত দ্রুত হয়। তৃণমূলও পিছনের দরজা দিয়ে অনেক পৌরসভা বা পঞ্চায়েত দখল করেছে, অনেকে তৃণমূলে অন্য দল থেকে এসে বড়ো পদ পেয়েছেন, কিন্তু নেতা হতে পারেননি। কারণ তাঁরা নিজেদের ওয়ার্ডেই লড়াই দিতে পারেননি, জেলা তো অনেক পরের কথা।

তাই তৃণমূলের এই সব ব্যর্থ নেতাদের নিয়ে দল বাড়িয়ে কোনো লাভ আছে? একজন বড়ো নেতা যিনি নিজের বুথে লিড দিতে পারেননি তার থেকে একজন বুথের নেতা যিনি নিজের বুথে লিড দিয়েছেন তিনি অনেক বড়ো। তাই নেতা নয় দলের সম্পদ বুথের কর্মী আর সেই সাধারণ কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধিই দলের বৃদ্ধি। তাই শূন্য থেকে প্রস্তুত হোক নেতৃত্ব।

—রাহুল চক্রবর্তী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

এন আর সি নিয়ে বিভ্রান্তি

এন আর সি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে শহরতলিতে ব্যাপক ভুলভাল প্রচার চলছে। পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে দিয়ে, ঘোলা জলে কারা মাছ ধরতে সচেষ্ট সে আমরা জানি, 'স্বস্তিকা'র নিয়মিত পাঠক হিসেবে বুঝি, সঠিক তথ্য উপস্থাপনা সম্পর্কে আপনারা সচেতন, কিন্তু সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলে যে আগুন লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে 'অসহিষ্ণু' বিভেদকামীরা, তার থেকে বাঁচার উপায় কী?

দিদির দলবল অসমে ঢুকতে পারেননি, বিমানবন্দর থেকে ফেরত আসতে হয়েছিল। ভূমিপুত্ররা বুঝিয়েছিলেন, আমাদের ব্যাপার আমরাই বুঝে নিতে পারব, বাইরের কারুর উস্কানির দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গের হাল সে তুলনায় অনেক করুণ, অবস্থা বড়ই কঠিন। সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার অবধি, ১২ সেপ্টেম্বর দিদির পদযাত্রা উপলক্ষ্যে বিটি রোড জুড়ে যে ব্যানার-ফেস্টুন-ফ্লেক্সের বিপুল উৎসব, তার অর্ধেকের বেশি অবদান দলীয় সংখ্যালঘু সেলের। ছড়া লেখা হয়েছে, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, এন আর সি নাহি চাই। পরিব্রাহী ডাক ছেড়ে হীরক রাজার শেখানো

ছড়ায় জবাব দিতে ইচ্ছে করে, অনাহারে নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ। দুনিয়ায় সকলেই সকলের ভাই, তো বেশ। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়া হলো ভাইয়েরই চাহিদা অনুযায়ী, এখন বেড়া টপকে গোরু-ছাগল যে ঘাসপাতা-শাকসবজি খেয়ে যাচ্ছে— শুধু তো তাই নয়, ভাইও ঘাসপাতা খেতে খেতে ঘরবারান্দায় উঠে আসছে, রোজকার কাজে নাক গলাচ্ছে, রোজগারে ভাগ বসাচ্ছে, তার কী উপায়? এই সহজ কথাটা কেন ভাই-ভাই-বাদীরা বোঝান না, যে বাপু হে, ভালোবাসাবাসি কি একতরফা হয়? থাকো না যে যার কাজ নিয়ে নিজ নিজ ঘরে, ঘাস খেতে অন্যের জমিতে কেন? আলাদা থাকলে সম্প্রীতি থাকে— গুরুজনরা সার সত্য বুঝিয়েছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বিপর্যস্ত রাষ্ট্র— Failed State, তো বেশ— এখানে তবে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বাঙ্গালিত্ব চাগিয়ে তোলার চেষ্টা কেন? সর্বোৎকৃষ্ট অভিনব পরিহাস হয়তো এটাই, দেশভাগের সময়ে মুসলিম লিগের মদতকারী বামাচারী রাজনীতিকদের চোখের মণি এক গীতিকারের গান ব্যবহার করছেন দিদিবাদীরা। পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা। ওরে পাগলা, সকল গৃহ হারালো যার, তাদের কণ্ঠে কি এমন বোকা বোকা আত্মবিশ্বাসী সুর শোভা পায়?

—রূপসনাতন রায়বর্মণ,
কলকাতা-৩১।

স্কুল-কলেজগুলিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন

কেরলের ত্রিশূরের শ্রী কেরলভার্মা কলেজে সিপিআই (এম)-এর ছাত্র সংগঠন এস.এফ.আই এক অতি ঘৃণ্য, পাশবিক ও

নারকীয় এক পোস্টার টাঙ্গিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের অতি আরাধ্য লর্ড আয়াপ্পা এক ঋতুমতী মহিলার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঋতুমতী মহিলাটি উপরে, আর তার নীচে দুই পায়ের মাঝে ভগবান আয়াপ্পার ছবি। কেরলের রাজনীতিতে লর্ড আয়াপ্পার প্রভাব যেমন সর্বজন স্বীকৃত, কেরলের সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনে লর্ড আয়প্পার প্রভাবও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

আবার এটাও খুব বিস্ময়ের যে একটা কমিউনিস্ট দল পরিচালিত রাজ্যে লর্ড আয়াপ্পার ভক্ত ও অনুরাগীদের সংখ্যা এতটা বেশি হয় কী করে? গোটা দক্ষিণভারতের কোটি কোটি অনুরাগী কেরলের শবরীমালা মন্দিরে ভিড় জমায় যেটা গোটা পৃথিবীর সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় নেতারা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে সেটা লক্ষ করেন।

যে লর্ড আয়াপ্পার কাছে পৌঁছনোর জন্য শবরীমালা পর্বতে উঠবার আগে শত সহস্র ভক্ত পাম্বা নদীতে পুণ্য স্নান করেন ও লর্ড আয়াপ্পার বিগ্রহে পুজো নিবেদন করেন সেখানেও লর্ড আয়াপ্পাকে নিয়ে এতটা নীচতা ও হীনতা কেন? যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কেরলে এস এফ আই-এর সমর্থকরা খ্রিস্টান বা মুসলমান তাহলেও কি কেরলবাসীর অন্তরের দেবতা লর্ড আয়াপ্পাকে নিয়ে ছবির মহিলার পায়ের মাঝখানে রাখা যায়? এতটা কালাপাহাড়ি রাজনীতির জন্ম এস এফ আই দিচ্ছে? এই ধর্মীয় উগ্রতা, ধর্মান্ধতা ভালো কিছুর জন্ম দেবে? এস এফ আই এবং সিপিআই (এম) নেতারা এ ব্যাপারে নীরব থাকেন কীভাবে?

সিপিআই (এম)-র বয়স্ক নেতারা এটাকে শ্রী কেরলভার্মা কলেজের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাছাড়া এই কলেজটি বিভিন্ন পাপাচার, ভ্রষ্টাচারের কারণেও কুখ্যাত। এম এফ হুসেনের নগ্ন সরস্বতীর ছবি এই কলেজেই শোভা পেয়েছে! দেবী সরস্বতীকে এতটা কুৎসিত করে আঁকবার কারণে হুসেনকে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল! সেই এম এফ হুসেনকে এস এফ আই-এর সদস্যরা বন্দনা করছে! লর্ড আয়াপ্পাকে অতি কদর্যভাবে স্থাপনা, আবার হুসেনকে বন্দনা সর্বোপরি গত বছর বিফ উৎসব সংগঠিত করার কারণে এই কলেজটিকে ব্ল্যাকলিস্টেড করা উচিত। অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ফৌজদারি অপরাধ! আইনি পদক্ষেপ করা উচিত এবং নীরব থাকাটা একেবারেই শ্রেয় নয়।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলোতে বিশেষ করে উত্তর মালদার কলেজগুলোতে ধর্মীয় বিষ ঢোকানোর ব্যাপারে এক অংশে মোল্লাতন্ত্র অনেক সক্রিয়। মালদহের চাঁচল কলেজ এবং চাঁচলের বিভিন্ন স্কুলে মৌলবাদীরা স্কুল-কলেজে ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় নমাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করে চলেছে। মুসলমান টি আই সি-রা কলেজ ছেড়ে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়ছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কলেজের বাইরে থাকছেন। মসজিদের মৌলবাদীদের কলেজের ভিতর ডেকে আনা হচ্ছে। বিগত ৫-৭ বছরে এই সব স্কুল এবং কলেজ থেকে বহু হিন্দু মেয়েকে মুসলমান ছেলেরা প্রেমের ফাঁদে ফেলে নিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আরও নানা ফন্দি এবং কৌশল করে নানা অপকর্ম ঘটানো হচ্ছে। কলেজে কলেজে ইদ ইফতার পালিত হচ্ছে। ইফতারের সময় বহিরাগতরা কলেজে ঢুকে পড়ছে।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি মালদহের কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মোথাবাড়ি, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভাদো, রতুয়া প্রভৃতি এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদের উপর কড়া নজর রাখা শুরু করুক। কালিয়াচক এবং চাঁচল, সামসী কলেজের কতিপয় ব্যক্তির গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক। এরা প্রায়শই মসজিদে গিয়ে নানারকম কাজকর্ম চালাচ্ছে। কলেজের হোস্টেলগুলো থেকে সরস্বতী পুজো উঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে। চাঁচল এলাকার বিভিন্ন বি.এড. কলেজের ফান্ডিং সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরজার। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাজপ্রাসাদের মতো বি.এড. কলেজ গড়ে উঠছে। কলেজগুলোতে কোনো ক্লাস হচ্ছে না। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে। জঙ্গিকার্যকলাপ মালদহ উত্তর দিনাজপুর ভীষণই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সামসী কলেজের কাছেই দুই জঙ্গি যারা ইটাহারের মানাইতে প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার চালাত তারা ধরা পড়েছে। তাদের ধরবার পর কেরল থেকে জে. এম. বি.-র আরেক জঙ্গিকে ধরা হয়। গোটা মালদহ, ইটাহার এবং ইসলামপুরে গড়ে উঠছে জঙ্গি মডিউল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থারা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

—শুভ্র সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থনকারীরা দেশদ্রোহী

বর্তমানে এন আর সি নিয়ে দেশের কোনায় কোনায় আলোচনা চলছে। অনেকের ধারণা পশ্চিমবঙ্গে বঞ্চিত হবে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে। বেশিরভাগ লোক হারাবে রাজনৈতিক অধিকার। যেমন হয়েছে অসমে, বাদ গেছে ১৯ লক্ষ লোক। এর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দু, বাকিটা মুসলমান। যতই নাম বাদ যাক না কেন বাংলাদেশ কোনো লোককেই ফেরত নেবে না। এরা ভারতে থাকবে অনাহূত অবস্থায়। যদি কোনো দেশে কারো রাজনৈতিক সুবিধা না থাকে তার বাঁচা মরা সমান কথা। যদিও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এদেশে এসেছে তারা কখনো নাগরিক সুবিধা থেকে বাদ যাবে না। পড়বে না কারোর ওপর ডি ভোটারের তকমা।

অনেক মানুষই জানে না এন আর সি কথার অর্থ কী। শুধু তারা জানে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেউই মানে বোঝার চেষ্টা করছে না। এন আর সি-র অর্থ ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সিটিজেন। মোটকথা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ নাগরিক। মোদী সরকারের উদ্দেশ্য মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত করা। যারা মানসম্মানের জন্য দেশত্যাগ করে ভারত এসেছে সেই হিন্দুদের তাড়ানো নয়। যারা লুটেপুটে খাওয়ার জন্য এসেছে তাদের চিহ্নিত করা। তাদের উৎখাত করলে নিশ্চয়ই কারো আঁতে ঘা লাগার কথা নয়। অনুপ্রবেশকারীদের যারা সাপোর্ট করে তারা দেশদ্রোহী।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

কন্যাসন্তানকে স্বাগত জানাতে সমাজ এখন প্রস্তুত

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে মহিলাদের পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা থেকে আরম্ভ করে তিন তালাক পর্যন্ত অনেক নেতিবাচক চিন্তাভাবনা ইতিবাচক পদক্ষেপে পরিবর্তন হয়েছে। হ্যাঁ, একথা সত্য যে সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়নি। এখনও মহিলা শিশু থেকে প্রৌঢ়া নানাভাবে লাঞ্ছিতা হয়ে চলেছে। তবে শুভদিনের সূচনা হয়েছে! এর প্রকাশ আমরা গ্রাম এবং শহরাঞ্চল উভয় স্থানে দেখতে পাই। এইরকম ঘটনা এখন চম্বলেও ঘটেছে। সেখানে এখন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। অতীতে অনেকসময় জন্মের পর নবজাত শিশুকন্যাদের মুখে তামাক দিয়ে বা খাটের পায়ার নীচে ফেলে পিষে মেরে ফেলা হতো, কিন্তু বর্তমানে সেখানে গান-বাজনা দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড জেলাতে গোহদ অঞ্চলের গ্রামে নবজাত শিশুকন্যা হত্যা করার অনেক ঘটনা সামনে আসত। এসব ক্ষেত্রে আত্মীয়দের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যার মামলা দায়ের করেছে। এইসব কুকীর্তি জানাজানি হয়ে গেলে বেশ কিছু সমাজসেবী সংস্থা সচেতনতা অভিযান শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে জনচেতনা জাগ্রত হয় এবং মেয়েরা পরিবারের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে সবাই বেশি আনন্দিত হয়। নবজাত কন্যাসন্তানটিকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনার সময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সেজন্য ওই অঞ্চলের লিঙ্গানুপাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন চোখে পড়ছে।

গত বছর ৪ মে কিরাতপুরা নিবাসী সোনা রমাশঙ্কর ভদোরিয়া জেলা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। খবর পেতেই তাঁর পরিবার-পরিজন খুব খুশি

হয়। সামাজিক সংগঠনের উপস্থিতিতে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা তাদের মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসেন। এরপর কিরতপুরা গ্রামের সংস্থাটি কন্যাসন্তান জন্মোপলক্ষ্যে সব গ্রামবাসীকে মিষ্টিমুখ করায়। গত বছর ২৯ জুন সুনীল লখেরের ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সারা পাড়ায় মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং গ্রামবাসী আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে। ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে করে সুনীল লখের মেয়েকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এছাড়া জেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত গাড়ির সামনে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে মেয়েকে স্বাগত জানিয়ে আনা হয়।

গোহদ গ্রামের লোকজন এখনও লজ্জিত বোধ করে, যখন স্মরণ করে, একসময় তারা তাদের সদ্যোজাত সন্তানদের সঙ্গে কী ভীষণ অন্যায় করেছে! ঘরোয়া গ্রামের একজন পিতা তার মেয়েকে জন্মের পর মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। গ্রামের লোকজন পুলিশে নালিশ করে। পুলিশ এরে মাটি খুঁড়ে সেই দুর্ভাগা মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং তার বাবার বিরুদ্ধে মামলা করে। ২০১৭ সালের ৩০ জুলাই মৌ থানার অন্তর্গত একটি তিন মাসের শিশুকন্যাকে তামাক খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করার অভিযোগে মেয়েটির ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমার বিরুদ্ধে মামলা চলছে। বাচ্চাটির মা রিমা যাদব এবং বাবা পবন যাদব পুলিশকে জানায় যে, জন্মের পরেই তাদের ছ'টি মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারা এই জঘন্য কাজে বাধা দিলে তাদের বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়।

সর্বোদয় সন্ত লল্লু দদ্দা সমিতির পালোয়ান সিংহ জানান যে, এই ঘটনা জানাজানি হলে ওই এলাকায় সচেনতা অভিযান প্রবল হয়ে ওঠে। ভিণ্ডে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সময় শহরে ১১টি সোনোগ্রাফি সেন্টার কাজ করছিল। সেন্টারগুলির ওপর কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পরিবার এবং সমাজ যখন কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানাতে আরম্ভ করেছে, তখন ভিণ্ড জেলার লিঙ্গানুপাতও বেড়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, আগে প্রতি এক হাজার ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৪৩, যা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৯৩৫। ওই এলাকায় কন্যা সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অভিনন্দনযোগ্য। সেজন্য ঘটনাটি পরিবেশন করা হলো। আমাদের দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই ধরনের সামগ্রিক জনচেতনা জাগ্রত হলে দেশের চিত্রটাই বদলে যাবে। নবজাগরণের এই জোয়ারে নবজাত কন্যাসন্তানকে স্বাগত জানাতে সমাজের প্রত্যেকে প্রস্তুত! ▮

ফলিকুলাইটিস

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ফলিকুলাইটিস রোগটির সঙ্গে হয়তো উপসর্গগত দিক থেকে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু অনেকেই আমরা ঠিক মতো জানি না রোগটি আসলে কী? রোগটি সম্পর্কে জানতে হলে আগে বুঝতে হবে ফলিকল কী? ফলিকল হলো ত্বকের সেইসব ছিদ্র যেখান থেকে লোম তথা চুল বের হয়। মানবশরীরে যত লোম রয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটি কোনও না কোনো ফলিকল থেকে বেরোয়। ফলিকলে কোনোভাবে সংক্রমণ হলে বা কেটে গেলে তাকে ফলিকুলাইটিস বলে। হাত-পা, বগল, গালে দাড়ি কাটার সময় মুখে খুব ঘষে ব্লিচিং-এর সময়ে; এমনকী পিঠেও হতে পারে ফলিকুলাইটিস।

কেন হয় ফলিকুলাইটিস?

ফলিকুলাইটিস হওয়ার একটা নয়, একাধিক কারণ রয়েছে। তবে সবচেয়ে কমন কারণ হলো দাড়ি কাটতে গিয়ে কোনোভাবে হেয়ার ফলিকলে আঘাত লাগলে ফলিকুলাইটিস হয়, বগলে বা হাতে শেভিং কিংবা ওয়াক্সিং করার সময়ে খুব জোরে চাপ দিলে দিনের পর দিন খুব আঁটোসাঁটো পোশাক পরলে ত্বককে সাবান বা অন্য কোনও শক্ত কিছু দিয়ে খুব জোরে ঘষলে মুখে বা পিঠে স্ক্রাবিঙের সময়ে ঘষতে ঘষতে কেটে গেলে, কোনও সুগন্ধী বা এমন কোনও জিনিস ব্যবহার করলে তাতে ফলিকলের সমস্যা হয়। ত্বকে দীর্ঘদিন প্লাস্টিক বা টেপ লাগিয়ে রাখলে ত্বকের সেই স্থানের কোষগুলি শ্বাস নিতে না পারলে, ত্বকের কোনও আঘাত থেকে কিংবা পতঙ্গের কামড়ের জায়গায় সংক্রমণ হলে ফুলে গিয়ে, সুইমিং পুলের জল অপরিচ্ছন্ন থাকলে, ক্যান্সার বা এচিআইভি জাতীয় কোনও রোগে দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে, অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বা অন্যের অপরিচ্ছন্ন রেজার ব্যবহারে ফলিকুলাইটিস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

উপসর্গ :

প্রাথমিক অবস্থায় ফলিকুলাইটিসকে একটা ছোটো লাল র‍্যাশ ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না, যার চারিদিকে সাদা বা হলুদ রঙের একটা প্যাচ থাকে, একটা অথবা কয়েকটা হতে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই ছোট্ট উপসর্গটি বাড়তে থাকে। লাল রাশ ক্রমশ লাম্ফে পরিণত হয়, লালচে শক্ত লাম্ফ যেখান থেকে পুঁজ বেরোতেও পারে আবার না পারে। আশেপাশের জায়গাগুলো লাল হয়ে যায়, ত্বকের প্রদাহ স্পষ্ট চোখে পড়ে। যেখানে ফলিকুলাইটিস হয়েছে সেখানে জ্বালা ধরা অনুভূতি, চুলকানি ও ব্যথা থাকে,। সবসময়ে মনে হয় একটা শক্তভাব। ব্যথাটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। খুব বেড়ে গেলে সঙ্গে হালকা জ্বর আসে।

ফলিকুলাইটিসের কারণ ব্যাক্টেরিয়াজনিত হলে সেখানে একটা দুর্গন্ধ থাকে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা :

শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফলিকুলাইটিস নির্ধারণ করা হয়। রোগীর সম্পূর্ণ মেডিক্যাল হিস্ট্রি নেওয়া হয়। অনেক সময়ে ফলিকল থেকে বেরোনো পুঁজ নিয়ে তা কালচার করার জন্য পাঠানো হয়, তাতে কী ধরনের ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস আছে দেখার জন্য। ফলিকুলাইটিস কোন পর্যায়ে রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। যদি ফলিকুলাইটিসের জায়গাটি খুব একটা শক্ত না হয় ও নিজের থেকেই পুঁজ বেরিয়ে আসে, তাহলে অ্যামোক্সিসিলিন, সেফিস্কিম, সেফপোডস্কিম ইত্যাদি গ্রুপের ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক ও লাগানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম দেওয়া হয়। মাথায় হলে অ্যান্টিবায়োটিক ও লাগানোর জন অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম দেওয়া হয়। মাথায় হলে অ্যান্টিফাংগাল শ্যাম্পু ব্যবহার প্রয়োজন।

প্রয়োজনে ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড খেতে হতে পারে। সঙ্গে গরম সেঁক খুব ভালো কাজ করে। যদিও ত্বক খুব শক্ত হয় ও পুঁজ না বেরোয়, তবে কেটে পাস বের করতে হয় অপারেশন করে।

মনে রাখতে হবে, ফলিকুলাইটিসের চিকিৎসা সঠিক সময়ে না হলে সেখান থেকে সেলুলাইটিসের মতো ত্বকের রোগ কিংবা ফলিকল চিরস্থায়ী ড্যামেজ হয়ে সেখান থেকে আর হেয়ার গ্রোথ হলো না, এমনটা হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : যদি জ্বালা থাকে তবে আর্সেনিক। এছাড়া কার্বোক্র্যানিম্যালিস এবং রাসটক্স ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ■

ছোটোবেলার মতো আজও একইভাবে দুর্গাপূজা উপভোগ করি

সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

ছেটোবেলা বার বার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম– মা, বর্ষা কবে শেষ হবে? মা বলত আর কদিন পরে। বর্ষার পরই তো শরৎ। মানে পূজা। কিছুদিন যেতেই আবার জিজ্ঞাসা করতাম পূজার আর কদিন বাকি? মা একটু রেগেই বলতো অতশত জানি না বাপু, এই আর কদিন পর। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম সাদা সাদা মেঘ কবে ভেসে বেড়াবে। তারপর একদিন ভোরবেলা পাশের পাহানপাড়া, মূলাহাটের সাঁওতালপাড়া থেকে মাদলের ধাতিং ধিং তা... কিংবা ডাঙ্গাপাড়ার ঢাকিদের ঢাকের ও সানাইয়ের শব্দ শুনে মন বলে ওঠে পূজার আর বেশিদিন নেই। তারপরেই চোখ পড়ে আমাদের ছোটো নদীর দু'পাড় কাশফুলে ভরে উঠেছে। চারিদিক শুধু সাদা আর সাদা। সকালে দেখতাম শিউলিগাছের তলা শিশিরভেজা শিউলিতে ঢেকে আছে। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতাম – বাবা, পূজার আর কতদিন বাকি? বাবা একটু হেসে বলতেন আর কুড়িদিন। মনের মধ্যে যেন যেন আনন্দের ফোয়ারা শুরু হয়ে যেত। আমাদের পাড়ায় দুর্গাপূজা হয় না। পাশের পাড়া বসন্তায় হয়। পাড়ার কয়েকজন মিলে দেখে আসতাম প্রতিমায় দুবার মাটি লাগানো হয়ে গেছে। তারপর প্রতিদিন দিনে দুবার করে দেখে আসতাম আর কতখানি এগোল। রবিবারে সারাদিন বসে বসে প্রতিমা গড়া দেখতাম। বাবা দুপুরে গিয়ে কান ধরে নিয়ে আসতেন। বসে বসে প্রতিমা গড়া দেখার যে কী আনন্দ!

একদিন বাবা আমাদের সবাইকে ডাকতেন। সবাই মানে আমরা সাত ভাই-বোন, দুই ভাগনি আর কাজের টুনাদাদা। টুনা পাহান। ভাগনিদের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানে। ওখানে নাকি গণ্ডগোল শুরু হবে, তাই ওদের এপারে আমাদের বাড়িতে রেখেছে। দুই ভাগনি বড়দার থেকে ছোটো, আমাদের

মহালয়ার ভোরে মা আমাদের ডাকাডাকি করে তুলে দিত। বলত তাড়াতাড়ি ওঠ, মহালয়া শুরু হয়ে হয়ে গেছে। আমরা চোখেমুখে জল দিয়ে বড়ো ঘরে এসে বসতাম। রেডিয়োতে তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু উদাত্তকণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণ, ভাষ্যপাঠ আর মন মাতানো গানের সুরে যেন পাগল হয়ে যেতাম। মনে হতো পূজা বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

থেকে বড়ো। মা বলত দর্জি এসেছে, জামার মাপ নেবে। তা আমরা সবাই হাজির হতাম। দর্জিকাকু সবার মাপ নিত। মা ভাগনি আর বোনের ফ্রক এনে দিত। দর্জিকাকু সেই ফ্রক মাদুরের ওপর রেখে মাপ মাপ নিত। মা বলত ওরা মেয়েতো, তাই দর্জি ওদের মাপ নেবে না। মাপ নিয়ে দর্জিকাকু চলে যেত আর আমরা দিন গুনতে থাকতাম কবে নতুন জামা হাতে আসবে। বাবা বলতেন পঞ্চমীর দিন। আমরা অধীর অপেক্ষায় থাকতাম কবে পঞ্চমী আসবে।

মহালয়ার ভোরে মা আমাদের ডাকাডাকি করে তুলে দিত। বলত তাড়াতাড়ি ওঠ, মহালয়া শুরু হয়ে হয়ে গেছে। আমরা চোখেমুখে জল দিয়ে বড়ো ঘরে এসে বসতাম। রেডিয়োতে তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু উদাত্তকণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণ, ভাষ্যপাঠ আর মন মাতানো গানের সুরে যেন পাগল হয়ে যেতাম। মনে হতো পূজা বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

এরমধ্যেই একদিন বাবা ১৪/১৫ টা নারকেল কিনে আনতেন। বাবার হাত থেকে নারকেল গুলো নিয়ে টুনাদাদা ছিবড়ে খুলতে শুরু করত। তারপর বাবা দায়ের পিঠের আঘাতে সমান দুভাগ করতেন। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম এত সমান কীভাবে হচ্ছে। বাবা নারকেল ভাঙতেন আর আমরা ভাই-বোনেরা গেলাস নিয়ে নারকেলের জল নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দিতাম। বরাবর শারীরিক ভাবে দুর্বল বলে আমি জল ধরতে পারতাম না। কিন্তু বাবা আমাকে শেষ নারকেলটার পুরো জলটাই আমাকে দিতেন। সে মনে হতো যেন অমৃত পান করছি।

দুপুরের পর কলাপাতা বিছিয়ে মা, বোন আর দুই ভাগনি নারকেল কুড়তে বসতো। সন্ধ্যায় নাড়ু তেরি হতো। সেই নাড়ুর গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করত। আমরা নাড়ু নেওয়ার জন্য ঘুর ঘুর করতাম। মা বলতেন কেউ কাছে আসবে না। পুজো শুরু হলে সবাই পাবে। তারপর কয়েকদিন ধরে চলত নানারকম নাড়ু তৈরির পালা।

পঞ্চমীর দিন সকালে স্কুল হয়ে পুজোর এক মাসের ছুটি হয়ে যেত। সেদিন ছুটির পরে আমরা কয়েকজন মিলে ছ'সাতটা পুজোমণ্ডপ ঘুরে আসতাম। দেখতাম সব প্রতিমারই চোখ আঁকা চলছে। সব মণ্ডপই তৈরি হয়ে গেছে। সেদিন বিকেলে দর্জিকাকু নতুন জামা দিয়ে যেত। নিজের নিজের জামা আর ইজের হাতে নিয়ে নাকে চেপে ধরে গন্ধ শুঁকতাম। কী সুন্দর গন্ধ। নতুন জামা বলে কথা! পরদিন ষষ্ঠী। সকাল থেকেই আশেপাশের গ্রাম থেকে ঢাকের শব্দ শুনে মনটা আকুলিবিকুলি করে উঠত। সকালেই বাবা আমাদের সবাইকে ডেকে বলতেন, পুজোর কটা দিন কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। কেননা বড়দা ছাড়া আমরা ভাইয়েরা প্রায় প্রতিদিনই পান থেকে চুন খসলেই দক্ষযজ্ঞ লাগিয়ে দিতাম। দুপুরের একটু পরেই আমরা আর পাড়ার বন্ধুরা নতুন জামা পরে পুজো দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। দশ-বারোটি মণ্ডপ ঘুরে ঘুরে রাত্রি নটা-সাড়ে নটায় বাড়ি ফিরতাম। বাড়ি ফিরে কোথায় কেমন প্রতিমা দেখেছি তা বাবাকে বলতে হতো। এভাবে সপ্তমী-অষ্টমী বিভিন্ন গ্রামে পুজো দেখা চলত। নবমীর দিন সকালে দাদাদের সঙ্গে জেলা শহর বালুরঘাটে পুজো দেখতে যাওয়ার আনন্দই পুজোর সেরা আনন্দ। শহরে এক একটা পুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম। কত রকমের প্রতিমা। কত রকমের থিম। কত রকমের আলোর কারসাজি। আমাদের গ্রামের পুজোয় তো হ্যাজাকের আলো। সারাদিন হেঁটে হেঁটে পুজো দেখে ক্লান্ত হয়ে রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরতাম। বাস থেকে নেমে আর হাঁটতে পারতাম না। বড়দা কোলে করে বাড়ি নিয়ে আসতো। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় পাড়ার বন্ধুরা মিলে হেঁটে ৭ কিলোমিটার দূরে হিলি শহরে পুজো দেখতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় রাস্তার ধারের সব মণ্ডপের ঠাকুর দেখেছিলাম। আবার হেঁটেই বাড়ি ফিরেছিলাম। সে এক অ্যাডভেঞ্চার। সেই রাত্রিতে ভোরবেলা বড়দা বলেছিল নবমীর রাতটা নাকি একটু বড়ো। মা দুর্গার মা মেনকা নবমীনিশিকে কেঁদে কেঁদে বলছেন রাত যেন শেষ না হয়। সকাল হলেই যে মা দুর্গা কৈলাসে ফিরে যাবে। বড়দা আবৃত্তি করে বলত– 'যেও না রজনী, আজি লয়ে তারাদলে/ গেলে তুমি দয়াময়ী, এ পরান যাবে। উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে/ নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।' শুনে ওই ছোটো বয়সেই মন ভারাক্রান্ত হয় যেত। মা মেনকার দুঃখে নয়, পুজোর আনন্দ শেষ হবার দুঃখে।

দশমীর দিন সকালে সবাই মিলে গেরস্থালির ছোটো ছোটো জিনিস– দা, কুড়ুল, কোদাল, কাস্তে, শাবল,লাঠি,বল্লম বটি,,চাষের সরঞ্জাম সব কিছু জলে ধুয়ে নিকানো তুলসীতলায় রাখতাম। গাই-বাছুর, বলদজোড়াকে টুনাদাদা স্নান করিয়ে বাইরে সারি সারি বেঁধে রেখে কপালে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে, শিঙে তেল মাখিয়ে দিয়ে টাটকা ঘাস খেতে দিত। তারপর সবাই স্নান সেরে তুলসীতলায় এসে দাঁড়াতাম। মা, বোন, ভাগনি গাই-বাছুর ও বলদদুটোকে ধান-দূর্বা দিয়ে পুজো করে আতপচাল, পাকাকলা খাইয়ে তুলসীতলায় এসে দাঁড়তো। বাবা স্নান করে নতুন ধুতি পরে এসে দাঁড়াতেই আমরা ধুয়ে রাখা জিনিসগুলেকে সিঁদুরের টিপ লাগাতাম। ওগুলোর মধ্যে সকালেই পুকুর থেকে ধরা একটা বড়ো পুঁটিমাছে সিঁদুর লাগিয়ে রাখা থাকতো। মা জিনিসগুলিকে ধান-দূর্বা দিয়ে পুজো করার পর বাবা সিঁদুর লাগানো পুঁটিমাছটি দিয়ে সবার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিতেন। আমরা সবাই বাবা-মকে প্রণাম করতাম। বাবা বলতেন বিজয়া শুরু হয়ে গেল। গ্রামে সবার বাড়িতেই এই আচার পালন করা হতো। এখন হয় কী না জানি না।

সেদিন বিকেলে আমরা পাশের গ্রাম ত্রিমোহিনীর দাপটকালীর মাঠে দশমীর মেলায় যেতাম। বিভিন্ন গ্রামের প্রতিমা ওখানে জমা করা হতো। বৃষ্টি এলে প্রতিমার রং উঠে ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাতো। সন্ধ্যার আগে দিঘিতে একে একে সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো। পুজোর আনন্দ শেষ। আমরা বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরে আসতাম।

বাড়িতে ফিরে বাড়ি বাড়ি বড়োদের প্রণাম করতে বেরোতাম। লক্ষ্মীপুজোর আগেরদিন পর্যন্ত চলত। প্রণাম করার পর সব বাড়িতেই বিভিন্ন রকমের নাড়ু দিত। ইজেরের পকেট বোঝাই করে নিয়ে আসতাম। সে এক বিশাল আনন্দ। মনে হতো সারা বছর যদি পুজো থাকতো।

আজ আমি যাটের কোটায়। এখন কলকাতায় থাকি। আজও আমি ছোটোবেলার পুজোর সেই আনন্দ, আবেগ, অনুভূতি একই ভাবে উপভোগ করি। সঙ্ঘ প্রচারক জীবনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় থাকার সময়ও কোনো ছেদ পড়েনি। ছোটোদের সঙ্গে আমি থাকতে ভালোবাসি। তাই আজও পুজোর কটাদিন তাদের সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে পুজো দেখি। তাদের সঙ্গেই অষ্টমীর অঞ্জলি দিই। আজও বর্ষাশেষে শরতের ছানাকাটা মেঘের অপেক্ষায় থাকি। কাশফুলের দোলা ও শিশিরভেজা শিউলি দেখার জন্য আজও আমি সাঁতরাগাছি, বাউরিয়া, ফুলেশ্বরের খোলা মাঠে বা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। আজও আমি সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে নির্মীয়মান দুর্গাপ্রতিমার সামনে একবার করে দাঁড়াই। তার কারণ হলো আমি যে ছোটোবেলাটা এখনও হারিয়ে ফেলিনি। ছোটোবেলার স্মৃতি রোমন্থন করি না। আমি ছোটোবেলাতেই আছি। আমি আজও ছোটোবেলার মন নিয়ে দুর্গাপুজো উপভোগ করি।

মহালয়ার দিন থেকে পুজো শুরু হয়ে যেত

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

দুর্গা পুজোর আনন্দ শুরু হতো জামা কাপড় কেনা থেকে পুজোর শেষে যাত্রানুষ্ঠান দেখা পর্যন্ত। ছোটোবেলায় মা আমাকে মঙ্গলা হাটে জামা, প্যান্ট কিনতে নিয়ে যেত। আমাদের ভাই-বোনেদের জামা কাপড় কেনা, দুর্গাঠাকুরের শাড়ি, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গামছা, বাবার ধুতি সব ঘুরে ঘুরে মঙ্গলাহাট থেকে কেনার স্মৃতি আজও আমার বেশ মনে পড়ে। ছোটোবেলায় আমার বড়দির একটা ঘটনা আমার এখনও মনে পড়ে;বড়দি একটা পিওর সিল্ক শাড়ি কিনে দেওয়ার জন্য জেঠুর কাছে বায়না করেছিল। জেঠু আমাদের ভাই-বোনদের জুতো দিতো তাই আলাদা ভাবে বড়দিকে শাড়ি কিনে দিতে চায়নি। কিন্তু বড়দি মাটিতে শুয়ে পড়ে কান্নাকাটি করে যেভাবে জেঠুর কাছ থেকে পিওর সিল্ক শাড়ি আদায় করেছিল তা এখনও আমার বেশ মনে পড়ে। আমরা সবাই বাবার সঙ্গে হাওড়া শিবপুরে পাঞ্জাব টেনারি বা ভারত টেনারিতে জুতো কিনতে যেতাম। জুতো কেনা হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেককে দুটো করে বেলুন দিত। বেলুন ফুলিয়ে বড়ো করা আর বেলুনের গন্ধ আজও আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমাদের তখন মহালয়ার দিন থেকেই পুজো শুরু হয়ে যেত। মহালয়ার দিন খুব ভোরে উঠতে হবে বলে আগের দিন রাত্রিতে তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়তাম। জেঠুর ঘরে একটা বুশ কোম্পানির ইলেক্ট্রিক রেডিও থাকতো। সেই রেডিওতে আমরা মহালয়া শুনতাম। ভোর ৪টায় গুরুগম্ভীর গলায় চণ্ডীপাঠ তার মাঝে মাঝে কিংবদন্তী সেই গানগুলো যা আজও একভাবে শুনি। কিন্তু এখন মহালয়া শোনা আর ছোটোবেলায় মহালয়া শোনার মধ্যে তাফাত অনেক। ছোটোবেলায় মহালয়া শোনার পর আমরা বন্ধুদের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতাম। একজন চোর হতো আর আমরা সবাই কোনো পাঁচিলের কোণে, পুকুরের ধারে গাছের আড়ালে লুকোতাম। যে প্রথম ধরা পড়ত সে আবার চোর হতো। সেই খেলায় মজাই ছিল আলাদা। সেইদিন থেকেই গুলি খেলা, খেলনা পিস্তলে ক্যাপ ফাটানো শুরু হয়ে যেত।

আমাদের স্কুল ছুটি পড়তো চতুর্থীর দিন প্রথম ক্লাস হয়ে। সেইদিন স্কুলে টিচারকে আমরা টিফিনের জমানো পয়সা দিয়ে মিষ্টি খাওয়াতাম।

পঞ্চমীর দিন ভোরে আমাদের প্যান্ডেলে দুর্গাঠাকুর আসতো। তাই ভোর হতেই দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মহিষাসুর, সিংহ কেমন হয়েছে দেখার জন্য পাড়ার প্যান্ডেলে চলে যেতাম। ষষ্টির দিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরকে গয়না এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করা হতো। আমি খুব ছোটোবেলা থেকেই সঙ্ঘের শাখায় যাই। সেই সময় আমাদের শাখায় মুখ্য শিক্ষক ছিল সঞ্জিতদা। ষষ্ঠী থেকে আমাদের শাখা সকাল ৬টা থেকে ৭টা হতো। সকালে কবাডি খেলার মজাই ছিল আলাদা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী— তিন দিনই পুজো এবং পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। বিকালবেলায় দাদার সঙ্গে হাওড়ার কদমতলায় ঠাকুর দেখতে যেতাম। কদমতলায় খুব সুন্দর সুন্দর ঠাকুর হয়। অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি, জাতীয় সেবাদল, উত্তর খুরুট বারোয়ারি ও বেলিলিয়াস রোডের ঠাকুরগুলো দেখে রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরতাম। দশমীর দিন সকালে আমার মায়ের মামার বাড়িতে (ষষ্ঠীতলায় ডাক্তার বাড়ি) পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার কথা খুব মনে পড়ে। একটা বড়ো পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র বলা হতো আর একচালার মা দুর্গাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। দশমীর দিন বিকালে পাড়ার ঠাকুরের সঙ্গে লরীতে বসে লজেন্স খেতে খেতে 'বলো দুগ্গা মাই কী—জয়— আসছে বছর— আবার হবে।' সবাইয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে বলতে গঙ্গায় ঠাকুর বিসর্জন তারপর লরিতে একসঙ্গে পাড়ায় এসে শান্তির জল এবং বোঁদে খাওয়া ছোটোবেলা থেকে এখনও করে আসছি। ছোটোবেলায় ঠাকুরের নির্দেশে আমরা সবাই কাগজের পাতায় 'শ্রীশ্রী দুর্গামাতার সহায়' ১০৮ বার লিখতাম। তারপর ঠাকুর ঘরে সমস্ত দেবতাদের প্রণাম করে গুরুজনদের প্রণাম করতাম। পাড়ায় গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি করা। কাকামণির বাড়ি, জেঠিমার বাড়ি গিয়ে প্রণাম করা গজা, নিমকি, ঘুগনি, মিহিদানা সন্দেশ খাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা। ছোটোবেলায় আমাদের পাড়ায় পুজোর শেষে যাত্রাপালা হতো। কমলে কামিনী। যাত্রার কথা আজও মনে পড়ে। ঝং করে বাজনার আওয়াজ দিয়ে যাত্রা শুরু হতো। যাত্রায় গান, সংলাপ, অভিনয়, কমলে কামিনী দর্শন আজও ভুলতে পারি না।

ছেলেবেলার দুর্গাপূজার কিছু স্মৃতি

শিশির কুমার গাতাইত

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত গোমকপোতা গ্রামে আমার জন্ম। আমাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবছর দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। পূজার এক-দেড় মাস আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ আরম্ভ হতো। তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে পুজোর আনন্দ-অনুভূতি জাগত। স্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে আমরা স্কুলের বন্ধুরা মিলে ঠাকুর তৈরি দেখতাম আর ভাবতাম কবে পূজার দিনটি আসবে।

তারপর দেখতে দেখতে অবশেষে সেই আনন্দের দিনটি এসে যেত। পুজোতে প্রায় একমাস স্কুল ছুটি থাকত। সেইজন্য পড়াশোনার তেমন কোনো চাপ থাকত না। পুজো প্রাঙ্গণে মনোহারি, তেলেভাজা, মিষ্টি এবং আরও অনেককিছু দোকান বসত। এককথায় বলা যায় একটি গ্রামের মেলা যেমন হয়। মা-বাবার সঙ্গে ওই পুজোর মেলাতে আসতাম। আমার মা অষ্টমী পুজোর ব্রত করতো, আমাকেও সঙ্গে করে মণ্ডপে নিয়ে আসত। আমি মায়ের কাছে বসে পুজো দেখতাম। ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা বাজত আর ধূপ-ধুনোতে সারা মণ্ডপ ভরে উঠত। একটা কথা আমার খুব মনে পড়ে— মা আমাকে বলত, ওই মায়ের মূর্তির দিকে দেখ, ওই মূর্তির মধ্যে সত্যিকার মা-দুর্গা এসে বিরাজ করবে। আমি তখন অধীর আগ্রহে দুর্গামায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তখন মায়ের ওই কথা শুনে আমার মনে কী যে আনন্দ অনুভব হতো সেটা এখনো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তারপর পুজো শেষ হলে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতাম।

আমাদের ওই পুজোতে সন্ধ্যার পর পর্দায় ভ্রাম্যমান বাংলা ছায়াছবি দেখানো হতো। পুজোর চারদিন একটি করে ছায়াছবি দেখানো হতো। আমাদের গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের লোকজন ছায়াছবি দেখার জন্য আসত। দুটো করে শো-এর মাধ্যমে দেখানো হতো। প্রচুর মানুষের সমাগমে পুজো প্রাঙ্গণ ভরে উঠত। তখন আমার মনের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। এর ফাঁকে দোকানে খাবার কিনে খাওয়া এবং জিনিসপত্র কেনাকাটা চলত।

এর আগের একটা কথা মনে পড়ে— পুজোর আটদিন আগে মহালয়া। ওইদিন ভোর চারটে থেকে শুরু হতো মহালয়া। তখন তো টেলিভিশন আসেনি, রেডিওতে চণ্ডীপাঠ শোনার জন্য রাতে ঘুম আসত না, ভোরে উঠতে হবে এই ভেবে। আমার বাবা-কাকা সবাই উঠত ভোরে মহালয়া শোনার জন্য। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মহালয় শোনার যে আনন্দ-অনুভূতি আজও আমি ভুলতে পারিনি।

আর একটা আনন্দ ছিল পুজোতে। আমার নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো কিনে দিত আমার দাদারা। আমরা তিন ভাই। আমি ছিলাম সবার ছোটো। দাদারা কলকাতায় চাকরি করতো। তাঁরা কিনে দিত আমার সবকিছু। সেই নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুজোর মেলাতে আসতাম। সেই মেলাতে নানা রকম জিনিস কিনতাম, অনেক কিছু খেতাম। অবশ্য দাদারাই আমাকে মেলা দেখার জন্য পয়সা দিত। তখন সেই আনন্দ-অনুভূতি যে আমার মনের মধ্যে কীভাবে ফুটে উঠত তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।

এইভাবে পুজোর চারটি দিন পার হয়ে যেত। অবশেষে এসে যেত দশমীর দিনটি। তখন মেলার অনুষ্ঠান শেষে বিসর্জনের পালা। ওই কয়দিন আনন্দের পরে এসে যেতো বিষাদের ছায়া। তখন মনটা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। বিসর্জনের একটা ঘটনা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ির কিছুটা দূরেই ছিল কংসাবতী নদী। ওই নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো। নৌকাতে প্রতিমাকে তুলে বেশ কিছুক্ষণ ভ্রমণ করে তারপর বিসর্জন দেওয়া হতো। সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। তখন এখনকার মতো পিচ দেওয়া রাস্তাঘাট ছিল না, মাটির কাঁচা রাস্তা ছিল। সেই বৃষ্টিতে ভিজে কাদামাটি লেগে নতুন জামা-প্যান্ট একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। কিছু করার তো নেই কী আর করা যাবে। এই অবস্থাতেও মনের মধ্যে কোনো কষ্ট ছিল না। এতেও যেন একটা আলাদা আনন্দ-সুখ-দুঃখ সবমিলিয়ে যে অনুভূতি পেয়েছিলাম তা আজও মনের মধ্যে দাগ কাটে।

এখন আমি চাকরি সূত্রে কলকাতায় বসবাস করছি। এখানেও দুর্গাপূজা দেখছি, এখানে কত আলোর কারুকার্য, প্যান্ডেলের চাকচিক্য দেখতে পাওয়া যায়। তবুও আমার ছেলেবেলার গ্রামের দুর্গাপূজার স্মৃতি আজও মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। ■

আবার এসো

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

ছোটোবেলায় পুজো আসছে টের পাওয়া যেত ক্লাবের মাঠে ম্যারাপের জন্য বাঁশ পড়লে। দু' এক দিনের মধ্যে শুরু হত দেড়-দু'হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে দড়ি দিয়ে মেপে খুঁটি পোঁতা। আড়াআড়ি বাঁশ বাঁধা। ত্রিপলের ছাউনি। ভিতরে রঙিন কাপড়ের আস্তরণ। দুর্গা মায়ের সপরিবারে অধিষ্ঠানের মণ্ডপ।

প্রতিমা আসতো চতুর্থী বা পঞ্চমীর মধ্যরাত্রে। ওই সময় আগমনীর আগমনের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সম্ভব হতো না। তাই সাধারণত ষষ্ঠীর সকালে মাতৃমুখ দর্শন হতো।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা থেকে বিজয়া দশমীর দুপুর থেকে রাত অবধি চলতো উৎসবের ঘনঘটা। নতুন জামা, প্যান্ট, জুতো। প্রায় সব বাড়িতেই তৈরি হতো নানা ধরনের খাবার। সে সময় হোটেল রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়ায় খুব বেশি প্রবণতা ছিল না। বাড়িতেই রকমারি ভোজ্যপদ তৈরি হতো। কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব বেশি থাকতো না। তাই খাবারের রকমফের নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। এই কদিন সকালে উঠে মুখ ধুয়ে, মুখে কিছু দিয়ে সটান পুজোপ্যান্ডেলে। পাড়াতুতো অভিভাবক আমাদের কিছু কাজ করতে বললে নিজেদের ধন্য মনে করতাম।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিন দুপুরে ভোগ বিতরণ হতো। পাড়াসুদ্ধ লোক সেই ভোগ পেত। কেউ কেউ বাড়ি নিয়ে যেত। আর একটা প্রথা ছিল 'সিধে' দেওয়া। ভোগের জন্য চাল, ডাল, সবজি, মশলা, তেল ইত্যাদি দেওয়া। সাধারণত অষ্টমীর দিন বেশি লোক সিধে দিত। পাড়ার মাতৃস্থানীয়ারা ষষ্ঠী ও অষ্টমীর দিন নিজ নিজ সন্তান এবং পরিবারের মঙ্গল কামনায় মানত করে উপবাস করতেন। এই দুদিন প্রায় সববাড়িতে নিরামিষ আহারের আয়োজন হতো। তবে নবমীর দিন ছাগ মাংস খাবার চল ছিল ব্যাপক ভাবে। অধিকাংশ বড়োরা তিনদিন পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। আমরা অষ্টমীর পূজাতেই পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণের পর প্রণত হয়ে নিরুচ্চার কাতর অনুনয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরুত— 'মা এবারটা ভালোভাবে পাশ করিয়ে দাও, সামনেরবার ঠিক মন দিয়ে পড়াশুনা করবো।' তখন পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললে কিছুদিনের মধ্যে শুরু হতো ফাইনাল পরীক্ষা। কারণ ফেল করলে বাড়িতে দুর্গতি আর নীচের ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে সহাবস্থান অনিবার্য। বোধহয় ক্লাস সেভেন, এইট পর্যন্ত এটা চলেছিল। তখন দশমীর দিনই প্রতিমা বিসর্জন হতো। তাই লোকে তিনদিন সন্ধ্যারাত থেকে বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা দেখার জন্য ভিড় করতেন। এই দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতাম।

আমার ছোটোবেলা সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় দশক। তখন এই বঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত সবকিছুই ছিল সমৃদ্ধ, ঋদ্ধ। সংগীত, সিনেমা, সাহিত্য, নাটক সবক্ষেত্রে ছিল নিত্য নতুন ভাবনার রূপায়ণ। পুজোর গান, পুজাসংখ্যা ইত্যাদির বাহুল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রায় সারদিন মাইকে গান বাজতো তবে পড়শীকে পীড়িত না করে। শিশু, কিশোর, বড়োদের শারদীয়া সংখ্যা প্রচুর পাওয়া যেত। প্রত্যেক বাড়িতে দু-চারটে করে পূজা সংখ্যার দেখা পাওয়াটা অবাক করা ব্যাপার ছিল না।

নবমীর রাত শেষ হলে দশমীর প্রভাত আসতো আজও যেমন আসে। মণ্ডপে পূজারি দধিকর্মার উপকরণ এসেছে কিনা খোঁজ নিচ্ছেন। নির্ঘণ্ট অনুসারে মায়ের বিসর্জন হবে। তার আগে দেবীকে শেষ নিবেদন এবারের মতো। পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ব্যাকুল আর্তি— 'পুনরাগমনায় চ'— এক তীব্র আকুতি অনুরণিত হয় উপস্থিত সকলের হৃদয়ে মনে— মা আবার এসো।

ইতিহাস সংকলন সমিতি ও ইন্ডিকার উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

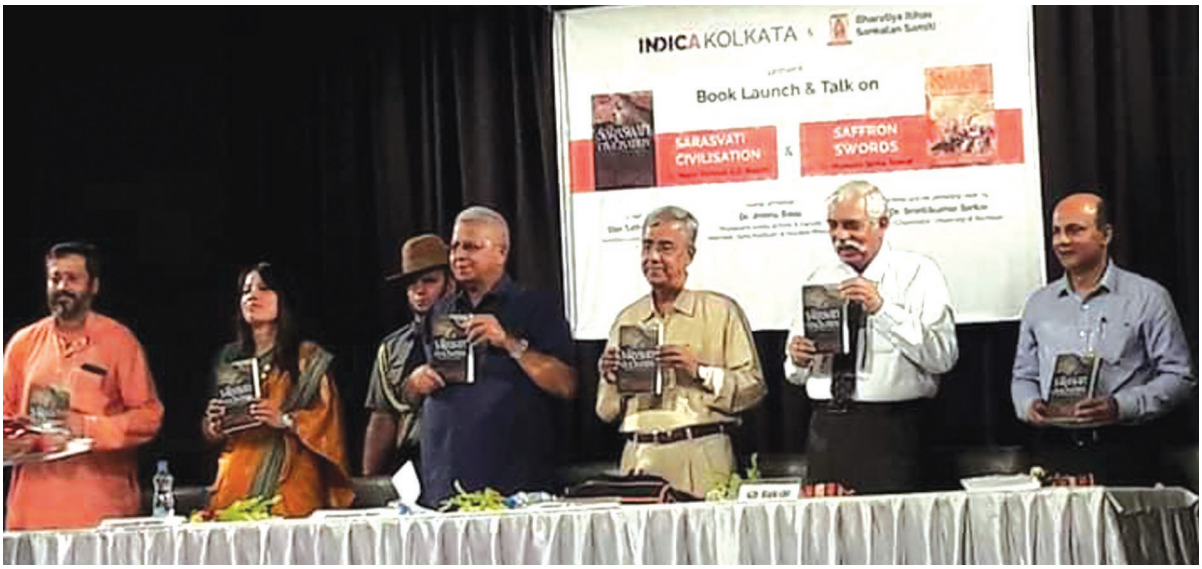

গত ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার কলাকুঞ্জ প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি ও ইন্ডিকার যৌথ উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জিডি বকশি এবং শ্রীমতী মানসী সিনহা রাওয়াল লিখিত দুটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে সংস্কার ভারতীর বেহালা শাখা। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. স্মৃতিকুমার সরকার, মুখ্য অতিথি মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়, বিশেষ অতিথি ড. জিষ্ণু বসু, জেনারেল জিডি বকশি ভারতমাতা ও ইতিহাস সংকলন সমিতির আদিপুরুষ বাবাসাহেব আপ্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

পুস্তক দু'টির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর আলোচনা সভায় শ্রীমতী সিনহা তাঁর 'স্যাফ্রন সোর্ডস্' গ্রন্থে উল্লেখিত প্রায় অশ্রুত ৫২ জন বীর যোদ্ধার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। মেজর জেনারেল বকশি তাঁর 'সরস্বতী সিভিলাইজেশন' পুস্তকের বিষয়বস্তু – পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে সরস্বতী নদী এই ভারতেই ৪ হাজার ৬০০ মাইল প্রবহমান ছিল তা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। তিনি বলেন, সরস্বতী নদীর গতিপথ ও অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রীরায় তাঁর বক্তব্যে দেশে ইতিহাস চর্চায় অপছন্দের বিষয় এড়িয়ে যাওয়া, সত্য ইতিহাস চেপে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে দেশভাগের কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস না থাকার হতাশা ব্যক্ত করেন। ড. জিষ্ণু বসু বলন, দেশের সত্য ইতিহাস না রচিত হলে শিক্ষার্থীদের মন ও মনন সঠিক ভাবে গড়ে উঠবে না। ড. সরকার বলেন, দেশকে জানার জন্য সত্য ইতিহাস চর্চার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন ইতিহাস সংকলন সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন।

সক্ষম-এর উদ্যোগে 'জাতীয় চক্ষু দান পক্ষ' উদ্‌যাপন

গত ২৫ আগস্ট সক্ষম-এর উদ্যোগে কলকাতার হরিয়ানা ভবনে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু দান পক্ষের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে চক্ষু দান বিষয়ে চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায়, মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, শঙ্কর নেত্রালয়ের ভগবতী প্রসাদ জালান, হরিয়ানা সোসাইটির অধ্যক্ষ রামচন্দ্র বড়গালিয়া, সাধারণ সম্পাদক প্রহ্লাদ কুমার ধানানিয়া, সক্ষমের প্রদেশ সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায় প্রমুখ। বন্দে মাতরম্ সংগীত পরিবেশনের পর সক্ষমের রাজ্য সহ সভাপতি অরিন্দম উপাধ্যায় এবং শঙ্কর নেত্রালয়ের শ্রীমতী মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরণোত্তর চক্ষু দানের জন্য সবার কাছে আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েক জন চক্ষু দানের অঙ্গীকার করন। ২০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। কয়েকজনের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক জনকে চশমা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আহ্বায়ক সত্যনারায়ণ আগরওয়াল।

কর্ণমাধবপুরে ‘কর্মযোগী’র বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রবাদী ও সমাজসেবী সংগঠন কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্ণমাধবপুরে সংস্থার মুখ্য কার্যালয় বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের সভাকক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের ১০ টি জেলা, অসম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশ থেকে ১১৬ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সভার শুভারম্ভ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা সমাজসেবী বিজয় গণেশ কুলকার্ণী ও কর্মযোগীর সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন কর্মযোগীর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট চক্ষুশল্যবিদ ডাঃ তরুণ কুমার সরকার, সমাজসেবী সনৎ কুমার বসুমল্লিক, দিলীপ রাহা, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অর্চনা মজুমদার প্রমুখ। কর্মযোগীর সম্পাদক অসীম মণ্ডল সংস্থার গত দু’বছরের সেবাকাজের প্রতিবেদন পাঠ

করেন এবং আগামীদিনের পরিকল্পনা জানান। হিসাব রক্ষক কিংশুক লাহিড়ী গত দু’বছরের হিসাব পেশ করেন। সভার সদস্যরা তা অনুমোদন করেন। সংস্থার সভাপতি আগামী বছরের জন্য ৮ সদস্যের উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং ২৬ সদস্যের পরিচালন সমিতি ঘোষণা করেন। সভায় সংস্থার স্মারক পুস্তিকা ‘কর্মযোগী’-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। সংস্থার সদস্য অতনু রায় ও কিংশুক লাহিড়ী গত দু’বছরের সেবাকাজের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করান। সভায় দুর্গাপুরের ‘ বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ’কে মানপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সুব্রত দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী তরুণ সরকার।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে হিন্দি দিবস সমারোহ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে সংস্থার সভাকক্ষে হিন্দি দিবস সমারোহের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. রাহুল অবস্থী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক মহাবীর প্রসাদ বাজাজ। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, ‘হিন্দিকে বিশ্বভাষা হতে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। কারণ তার উপযোগিতা ও যোগ্যতা সারা বিশ্ব

ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হিন্দিকে রোজগারের ভাষা বানানোর পথে বাজারের ভাষা করতে গিয়ে বাজারি ভাষা যেন না হয়ে যায়।’ সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন অধ্যাপক ড. রামপ্রবেশ, উমেশ চন্দ্র কলেজের ড. কমল কুমার, ড. মনীষা ত্রিপাঠী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে গীত পরিবেশন করেন ওমপ্রকাশ মিশ্র। হিন্দি বন্দনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সাহিত্য সচিব বংশীধর শর্মা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যোগেশরাজ উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার গাঙ্গুলীবাগানে ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের ভারতমাতা পূজা

দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলীবাগানে গত ১৪-১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারত দিবস উপলক্ষ্যে ভারতমাতার পূজার আয়োজন করে ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘ। পূজার উদ্বোধন করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে ছোটোদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাতে ২৫০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। এছাড়া গরিব শিশুকন্যাদের ফ্রক, বালকদের জামা-প্যান্ট ও মায়েদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ভাগ সঙ্ঘচালক সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের সবাপতি ত্রিদীপ সরকার প্রমুখ।

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা মহানগরের মানিকতলার মহর্ষি দধীচি ভবনে মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে মহা সমারোহে মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত কাকড়া। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান পত্রিকার স্থানীয় সম্পাদক রবীন্দ্র রায়, কলকাতা নগর নিগমের পার্ষদ শ্রীমতী মীনাক্ষী গুপ্তা এবং বিজয় ওঝা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের অধ্যক্ষ কেশবদেও তিওয়াড়ী।

সমাজ কল্যাণে মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পূর্বতন পার্ষদ রাজকিশোর গুপ্তা। অনুষ্ঠানে নোয়েডার এমিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. শিল্পা আসোপাকে 'পণ্ডিত গণপতরায় মিশ্র প্রতিভা সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। এছাড়া এবছরের 'সাগরমল পলোড় সেবা সম্মান' পবন কুমার দায়মাকে প্রদান করা হয়। শিশুদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা, নিবন্ধ প্রতিযোগিতা, মেহেন্দি রচনা, আরতী থালী সজ্জা এবং ফেন্সি ড্রেস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বংশীধর শর্মা।

বাঁকুড়ায় সংস্কৃতপ্রেমী সাংসদকে সংবর্ধনা

গত ১৯ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া শহরের বঙ্গ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে এক সভায় বাঁকুড়া লোকসভার সংস্কৃপ্রেমী সাংসদ বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুভাষ সরকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, পাঁচমুড়া কলেজ-সহ জেলার বিভিন্ন স্কুল-কতেজের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সংস্কৃতপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ডাঃ সরকার বলেন, সংস্কৃত এমন একটি ভাষা যা উচ্চারণ করলে দেহ ও মন পবিত্র হয়। তিনি সংস্কৃতভারতীর পাশে থেকে রাজ্যের পুরাতন টোলগুলির পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস দেন। সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ বলেন, ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ৪ জন সহ সারা দেশের ৪৭ জন সাংসদ সংস্কৃতে শপথবাক্য পাঠ করেছেন। এটি সংস্কৃতভাষা পুনরুজ্জীবনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সন্ধ্যারতির প্রসাদ সাত হাজার চন্দ্রপুলি

টের পেয়েছেন নিশ্চয়ই বেলা একটু ছোটো হয়ে আসছে। সবরকম অর্থনৈতিক মন্দার হা হুতাশকে পেছনে ফেলে দোকানে দোকানে ফিরে এসেছে কোলাহলমুখর কেনা-বেচা। হ্যাঁ, বাতাসে এসে গেছে বাঙ্গালির সবচেয়ে মহার্ঘ্য সুগন্ধী পুজোর গন্ধ। স্বস্তিকা সহ-সম্পাদক বললেন একটা বনেদি পুজোর অনুভব নিয়ে লিখুন। মনে পড়ে গেল আমাদের সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গের সভানেত্রী শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়ের কথা। বেহালার রায় বাহাদুর রোডে (বেহালা থানা থেকে দু মিনিট) তাঁদের 'অমরেন্দ্র ভবন'-এ গিয়ে মুখোমুখি হলাম নীলাঞ্জনাদির।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

□ দেখুন এ বাড়ি দেখে মনে হয় পুজো, অনুষ্ঠান মিলনক্ষেত্র ইত্যাদির জন্যেই যেন তৈরি।

নীলাঞ্জনা : হ্যাঁ এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন আমার দাদা শ্বশুর স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৩২ সালে। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের এ জি। এই যে রাস্তা রায় বাহাদুর রোড সেটি তাঁর পিতা অম্বিকাচরণের নামে। এ বিষয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলব, এই রায় পরিবার (আদিতে চট্টোপাধ্যায় মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের দ্বারা রায়চৌধুরী ও রাজা খেতাব পান)। আদি নিবাস মধ্যমগ্রাম থেকে ১৭৫৬-য় তৎকালীন গ্রামাঞ্চল বেহালায় এসে বসবাস শুরু করেন ও দুর্গাপুজোর পত্তন করেন। কালক্রমে পরিবার বড়ো হয়ে আশপাশে ছড়িয়ে পড়লেও পালা করে দুর্গোৎসবটি চলতে থাকে। অম্বিকাচরণ ছিলেন ইংরেজি ছাড়াও আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শী। তিনি ইংরেজ প্রশাসকদের অনুবাদক হিসেবে সফল হন ও রায় বাহাদুর উপাধি-সহ প্রভূত সম্মান

পান। তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থে দুর্গাপূজা চালু রাখতে একটি অছি পরিষদ গঠন করে যান। যার বর্তমান অছি আমার স্বামী ও দেবর সুবীর ও গৌতম রায়। হ্যাঁ, বাড়ির কথায় বলা যায় এখানে নাটমন্দির ও ঠাকুর দালানকে ঘিরে তিন দিকের যে বড়ো দালান দেখছেন সেখানে একসঙ্গে দু'সারি লোক এক সময় বসে আহার করতেন। মাঝখান দিয়ে হতো পরিবেশন।

□ বিশেষ কোনো বিধি নিয়ম বা রীতি?

নীলাঞ্জনা : হ্যাঁ, মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত আমাদের এখানে প্রতিদিন নারায়ণ পুজো ও চণ্ডীপাঠ হয়। বোধন ঠাকুরদালানেই হয়। নবপত্রিকা স্নান গঙ্গায় হয় না। ঠাকুরদালানেই বড়ো গামলায় জল রেখে নবপত্রিকা দাঁড় করিয়ে স্নান হয়। সেই জল কিন্তু পরিবারের যে যেখানে যায় সেখান থেকে নিয়ে আসে। সে জল সমুদ্রের হতে পারে, নদীর হতে পারে, যে কোনো তীর্থ বারি হতে পারে, যেমন ধরুন এবার আমি 'লে' গেলাম সেখান থেকে নিয়ে এলাম সিন্ধুনদের জল। আবার পুষ্কর গঙ্গাসাগর থেকেও আনা হয়েছে জল। সেই সংগৃহীত জলে নানা রকমের সুগন্ধি মিশিয়ে স্নান সম্পন্ন হয়। হ্যাঁ, বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হিসেবে এ কাজটি আমারই বরাদ্দ। পুজো হয় কালিকা পুরাণ মতে।

□ পুরোহিত বা কামার, কুমোর—এরাও কি দীর্ঘদিন ধরে পুজোয় যুক্ত?

নীলাঞ্জনা : হ্যাঁ, এখন যিনি পুজো করছেন রণদেব ভট্টাচার্য তাঁর বাবাও দীর্ঘদিন করেছেন। তার আগে বেহালা পণ্ডিত সমাজের এক আচার্য এই পুজো করতেন। ঢাকি ঢুলিরাও বংশানুক্রমিক ভাবেই পুজোয় অংশ নেয়। পুরনো যৌথ পরিবারে ছাগবলির রেওয়াজ থাকলেও এই বাড়িতে ১৯৭৬ সাল থেকে বরাবরই আনাজ বলি হয়। বলি দেওয়ার কামারও বংশানুক্রমেই নিযুক্ত। আর একটা বিষয়, দুর্গাপুজোয় সন্ধি পুজোর গুরুত্ব অসীম, সেখানে সাধারণত বিশেষ ভোগান্নের ব্যবস্থা হয়। আমাদের এখানে কিন্তু শুধু মাত্র শুকনো ভোগ দেওয়ার রীতিই দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। সেই ভোগের পরিমাণ কিন্তু বিশাল। সেই পাত্রটির আকার প্রায় একটি গোরুর গাড়ির চাকার মতো। সন্ধি পুজোতেই মায়ের উদ্দেশে ছাতা, পাদুকা, শয্যার সঙ্গে একটি নতুন বেনারসি কাপড়ও উৎসর্গ করার রীতি আছে। শুকনো নৈবেদ্য থাকে। ৭ কেজি চাল, ২৮টি ডাব, নাড়ু, পাঁচ কড়াই ইত্যাদি।

□ আপনাদের তো প্রাচীন পরিবার পাড়াপড়শীর অংশগ্রহণ, উৎসাহ কেমন?

নীলাঞ্জনা : আমাদের পুরনো পাড়া প্রতিবেশীরা অধিকাংশই এখানে অঞ্জলি দিতে আসেন। আরতির সময়ও লোক সমাগম হয়। আগে বেহালা যখন মূলত গ্রামাঞ্চল ছিল সেই ৭০/৮০ বছর আগে সমস্ত গ্রামবাসীরাই পুজোর তিন দিন মধ্যাহ্ন ভোজ এমনকী রাতের আহারও পুজোবাড়িতে (পুরোনো) সেরে যেতেন। তবে এখন বেহালার রূপ তো পালটেছে। আগের মতো গভীর রাত অবধি খাওয়া- দাওয়া না চললেও সপ্তমী ও নবমীতে প্রধানত মধ্যাহ্নভোজে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, পুরনো বেহালাবাসীদের একটা বড়ো অংশ আমন্ত্রিত হন। হ্যাঁ, দুবেলা পাত পেড়ে খাওয়ানো সম্ভব না হলেও প্রতিদিন সন্ধ্যারতির প্রসাদ হিসেবে ৭ হাজার চন্দ্রপুলি দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরিত হয়।

বিশেষ জনসমাগমে পূজা প্রাঙ্গণ যখন মুখরিত হয়ে ওঠে, তখন বারোয়ারি পুজোর ভিড়ের সঙ্গে ফারাক লুপ্ত হয়ে যায়। এখনকার বেহালায় আশপাশে অনেক বড়ো বড়ো ক্লাবের পুজো হয়। কিন্তু আমাদের বাড়ির ঠাকুর দেখতেও বড়ো লাইন পড়ে। ভিড় সামলাতে এজেন্সি থেকে আমাদের নিরাপত্তারক্ষী অবশ্যই রাখতে হয়। তবে খুবই আনন্দের কথা আমাদের পাড়ার পরিচিত লোকেরাও শুভার্থী হিসেবে একাজে যোগ দেন। আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে অনেক দর্শনার্থীই এই শ্বেতপাথরের দালানে বসে শুয়ে দীর্ঘক্ষণ জিরিয়ে নেন। বাড়ির মূল ফটক প্রায় রাত ১২টা অবধি খোলা থাকে তখনও অনেককে অনুরোধ করে বাড়ি পাঠাতে হয়। দীর্ঘদিনের পরিবারের কাজে যুক্ত কর্মীরাও ভিড় সামলান। সমগ্র দালানগুলি মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক জিনিসপত্রে ঠাসা থাকায় একটা সময় দরজা বন্ধ করতেই হয়। আর একটা বিষয় বলতে ভুলেই গেছি সন্ধি পুজোয় শুকনো ভোগ হলেও পুজোর তিন দিনই দেবীকে মাছ দেওয়া হয়। সেখানেও বৈচিত্র্য আছে। সপ্তমীতে পোনা ও পার্শ্বে মাছ, অষ্টমীতে চিংড়ি আর ভেটকি, নবমীতে ইলিশ মাছের আমিষ ভোগই প্রচলিত। আর দশমীতে পান্তা।

□ আগেকার কথা যতটা প্রাচীনাদের মুখে শুনেছেন বা আপনি যা দেখেছেন তাতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন এসেছে?

নীলাঞ্জনা : এসেছে বইকী। যে নৈবেদ্য ঘর দেখলেন সেখানে এক সময় পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ারাও সানন্দে সদলবলে বসে পুজোর জোগাড় করতেন। মাতিয়ে রাখতেন। এখন অনেকেই দূরে চলে গেছেন। কেউবা বিদেশে। এখানে এলে একবার ঘুরে যান। আর ওই যে বললাম চার বছর শরিকদের মধ্যে পালা করে পুজোর ব্যাপারটি তো আছেই। সেখানে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। আর একটা জিনিস, রাতে যে অতিথি অভ্যাগত ভোজন হয় তা কিন্তু একেবারে আধুনিক রীতিতে ক্যাটারার দিয়ে করানো হয়। তবে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা যেমন গাড়ির চালক, রান্নার ঠাকুর, নিত্যদিনের গৃহ পরিচর্যার লোকজন, হিসাবপত্র রাখার সহযোগী, গেটের প্রহরী এঁদের অনেকেই অন্য প্রদেশের। পুজোর সময় সচরাচর যা দেখা যায় যে এরা নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যান, এখানে হয় উল্টো। এঁদের গোটা পরিবার উঠে আসেন এই বাড়িতে। এখানে থেকে তাঁরাও পুজোর আনন্দের সমান অংশীদার হয়ে ওঠেন।

□ প্রতিমা নিরঞ্জনের কোনো বিশেষ প্রথা?

নীলাঞ্জনা : না, সেরকম কিছু নয়। তবে আমাদের দেবী গঙ্গায় ভাসান হয় না। বাড়ির পিছনেই আমাদের নিজেদের পুষ্করণীতেই বিসর্জন দেওয়া হয়। মা সারা বছর তাঁর অবিনশ্বর মৃন্ময়ী রূপ নিয়ে আমাদের পরিবার সংলগ্ন হয়েই থাকেন।

হঠাৎ একটানা সুরেলা ঘণ্টাধ্বনিতে বারোটা বাজল। বিশাল গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটি বাড়ির সদর ঘরের কাছেই বেজে চলেছে। জানলাম বাড়িতে 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর মতো ঘড়িবাবু এসে এমন বহু প্রাচীন সব ঘড়িতে সপ্তাহান্তে দম দিয়ে যান। পাশের ঘরে তখন পুজো সংক্রান্ত কয়েকটি ছবি কম্পিউটারে স্ক্যান করা হচ্ছে। অতীত ও বর্তমান দুটি টাইম জোনের প্রতীককে সংঘাতহীন ভাবে অনায়াসে অনুসরণ করে চলাই ৪/১ রায় বাহাদুর রোডের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দাদের অসামান্য বাহাদুরি। ■

তালতলা পালবাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দেখতে দেখতে আবারও এসে গেল বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। তাই চারিদিকে সাজো সাজো রব। কেননা জগন্মাতা আসছেন, তাঁকে তো বরণ করে নিতে হবে। সেজন্য প্রকৃতিও সাজাচ্ছে তার বরণ ডালা। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, বাগানে কাশফুলের সমারোহ, শিউলির সুবাস— এই ত্রয়ীর সমন্বয় হলেই আপামর বাঙ্গালি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দেবী দুর্গা আমাদের কাছে কন্যা, আবার জননীও। এক বছর পরে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরছে, তাঁকে তো অভ্যর্থনা করতে হবে, সাধ্যানুযায়ী প্রতিটি বনেদি পরিবার যা করে থাকেন শারদোৎসবের পাঁচটি দিন। এরকমই নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে জগজ্জনীর আরাধনা করা হয় মধ্য কলকাতার তালতলা অঞ্চলে ৯৬/বি, এস.এন.ব্যানার্জি রোডস্থ পাল পরিবারে। যার সূচনা সুদূর অতীতে, দুইশো পয়তাল্লিশ বছর আগে, ইংরেজি ১৭৭৫ সালে।

দুর্গাপুজোর বর্ণনায় যাবার আগে পাল পরিবারে সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। এদের আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার পোলবা গ্রামে। পাল বংশের আদিপুরুষ নকুড়চন্দ্র পাল ইংরেজি ১৭৪২ সালে বর্গি আক্রমণের সময় কুলদেবতা 'শ্রীধর জীউ'কে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং মধ্য কলকতার তালতলা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুত্র রঘুনাথ পাল ইংরেজি ১৭৭৫ সালে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট ঠাকুরদালান তৈরি করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে যা আজও অব্যাহত। পরবর্তীকালে শরিকদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাজনের সময় ঠাকুরদালানের কিয়দংশ ভাঙ্গা পড়ে। ফলে ঠাকুরদালানটি তিন খিলানে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৭৭৫ থেকে ২০১৮ এই সুদীর্ঘ সময় কালে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক উত্থান পতন ঘটেছে, কিন্তু দুর্গাপুজোয় তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। এমনকী পুজোর আচার- অনুষ্ঠানেও কোনও পরিবর্তন হয়নি, জানালেন পরিবারের প্রবীণ সদস্য নিখিলরঞ্জন পাল মহাশয়।

পাল পরিবারের উত্তরসূরি রাইচরণ পাল ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন

ব্যক্তি। দুর্গাপুজোর স্থায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশে তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং চার সদস্যের এই ট্রাস্টই বর্তমানে দুর্গাপুজো আয়োজনের দায়িত্বে নিয়োজিত। তালতলা এলাকায় রাইচরণ-এর বহু জনহিতকর কাজের নিদর্শন রয়েছে। দুঃস্থদের বিনা বেতনে পড়াশোনার জন্য স্কুল ও চিকিৎসার জন্য তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পূর্ব কলকাতার গোবরাতে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তা (রাইচরণ পাল লেন) আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে পাল বাড়ির দুর্গাপুজো 'রাইচরণ পাল'-এর পুজো নামে সমধিক পরিচিত।

কোনও কাঠামো পুজোর রীতি নেই। রথযাত্রায় মৃৎশিল্পীকে প্রতিমা তৈরির জন্য বায়না দেওয়া হয়। প্রতিপদাদি কল্পে দেবী বোধন হয় মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ তিথিতে। সেদিন থেকেই পুজো, চণ্ডীপাঠ, আরতি শুরু হয়ে যায়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা বাবুঘাট থেকে স্নান করিয়ে এনে উঠোনে রেখে পুজে করার পরে সিদ্ধিদাতা গণেশের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপন করা হয়। এরপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান করে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

ডাকের সাজে সজ্জিতা সালংকারা দেবীমূর্তি। এক চালচিত্রে দেবী দশভূজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। দেবী দুর্গার বাহন শ্বেতবর্ণের সিংহ। অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। কুমোরটুলির স্বনামধন্য শিল্পী নিমাই চন্দ্র পাল দীর্ঘদিন যাবৎ পাল পরিবারের দুর্গাপ্রতিমার রূপদান করছেন।

বৈষ্ণব মতে পুজো হয় বলে বলির প্রথা নেই। পাল পরিবারে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে লুচি, তিন রকম ভাজা ও দুই রকম মিষ্টি মা দুর্গাকে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। সংকল্প হয় পালাদারের নামে।

নবমীতে কুমারী পুজো পাল পরিবারের দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনূর্ধা নবম বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে মালা পরিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পায়ে আলতা পরিয়ে দেবী জ্ঞানে পুজো করা হয়। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আগে ঠাকুরদালানে পালাকীর্তনের আসর বসতো। একই ব্রাহ্মণ পরিবার বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্য করছেন। দুর্গাপুজো ছাড়াও একই ঠাকুরদালানে কালীপুজো ও কার্তিক পুজোও অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর ক'দিন প্রতিমা দর্শন করতে পাল বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

বিজয় দশমীতে কণকাঞ্জলি দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো হয়। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী আউটরাম ঘাটে প্রতিমা নিরজন হয়। ফিরে এসে ঠাকুরদালানে সকলে মিলিত হয়ে শান্তিজল গ্রহণ, বিল্বপত্রে 'শ্রীশ্রী দুর্গাসহায়' লেখা ও পারস্পরিক বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হয়। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা। সকলের কণ্ঠে তখন একটাই প্রার্থনা 'আবার এসো মা'।

এই প্রতিবেদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন পাল পরিবারের সদস্য অনির্বাণ পাল ও সুব্রত পাল। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

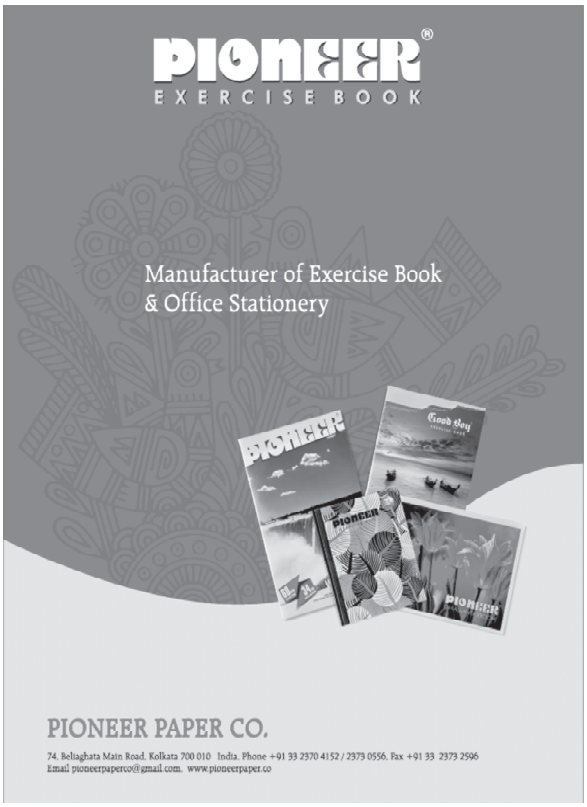

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

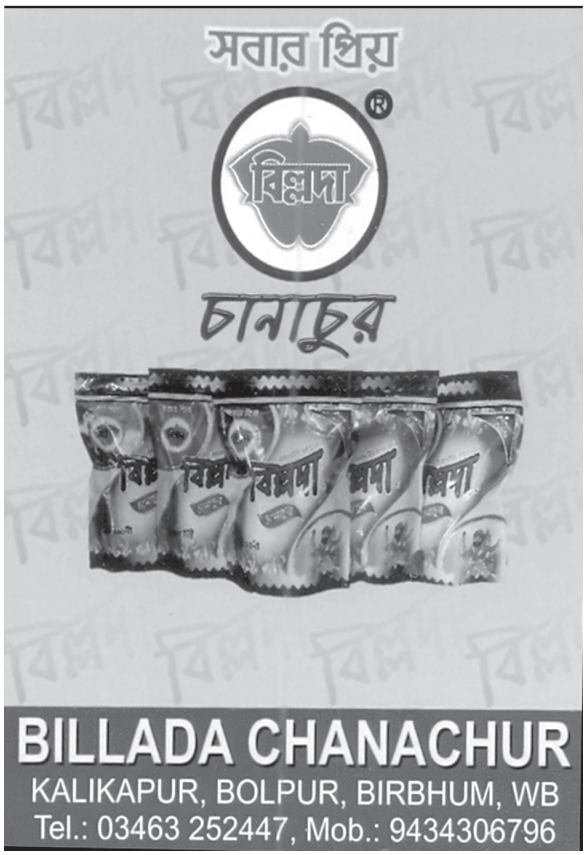

যা হারিয়ে যায়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পুজো আসত পায়ের ফোসকার সঙ্গে। মহালয়ার আগের দিন স্কুল হয়ে ছুটি পড়ে যেত। একেবারে সেই কালীপুজো-ভাইফোঁটা অবধি। যেদিন স্কুলে ছুটি পড়ত, সেদিন সন্ধেবেলাই মা-র হাত ধরে নতুন জুতো কিনতে যাওয়া। মানিকতলার মোড়ে বাটার দোকানে। প্রতিবছর একই ধরনের জুতো— মুখ ভোঁতা কালো শু। সঙ্গে দুজোড়া সাদা মোজা। পুজোর কদিন রোজ জুতো জোড়া সাদা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে রাখার একটা উৎসাহ থাকত। পুজোর পর সে উৎসাহ উধাও। তখন বাটায় জুতো কিনলে বাচ্চাদের মুখোশ দিত। বাঘের মুখোশ খুব পছন্দ ছিল আমার। বেছে বেছে বাঘের মুখোশ নিতাম। আমাদের বারো পরিবার একসঙ্গে থাকার প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন বাড়িটিতে আমার খেলার সঙ্গী ছিল দীপক আর বাপি। ওরাও বাটা থেকে মুখ ভোঁতা কালো রঙের শু কিনত। ওরাও বাঘের মুখোশ নিয়ে আসত বাটার দোকান থেকে। মহালয়ার বিকেল থেকেই বাঘের মুখোশ পরে আমরা বাড়ির সামনের ফুটপাথে ছোটাছুটি করতাম। ষষ্ঠীর আগেই সে মুখোশ ছিঁড়ে ফর্দাফাই। তখন পুজোর সময় আবার নতুন বায়না। দীপক পায়ের নীচে চাপ দেওয়া কটকটি ব্যাঙ কিনলে আমি কিনতাম ক্যাপ আর খেলনা বন্দুক, বাপি কিনত ক্যাম্বিস বল। ভাগাভাগি করে খেলতাম আমরা। আর প্রতিবারই দশমীর পরদিন বাপির ক্যাম্বিস বল হারিয়ে যেত।

উত্তর কলকাতায় আমাদের লালাবাগান পাড়ায় প্রতিমা আসত পঞ্চমীর রাতে। তখন এরকম থিমের পুজো ছিল না। সাবেকি প্রতিমা আসত। বিশ্বকর্মা পুজো পার হতেই প্যান্ডেলের বাঁশ পড়ত। আর প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হতেই রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে প্যান্ডেলের বাঁশে ঝুলে দোল খাওয়া একটি নিত্যকর্ম ছিল আমাদের। মহালয়ার পর পর প্যান্ডেল শেষ। তারপর আলোর শিকলিতে পাড়া সেজে উঠত। তৃতীয়া থেকেই সাড়া পাড়া আলোয় ঝলমল। তখন একটি অলিখিত নিয়ম ছিল আমাদের বাড়িতে। মহালয়ার দিন থেকে আর কেউ পড়তে বসতে বলত না। তখন শুধুই ছুটি। বাড়িতেও দেখতাম বড়রা হেসে হেসে কথা বলত। কখনো কেউ রাগ করত না। পঞ্চমীর দিন অনেক রাতে প্রতিমা আসত প্যান্ডেলে। কখন আসে তা দেখিনি কখনো। রাস্তার ধারে জানলায় অনেক রাত অবধি বসে থাকতাম, কখন প্রতিমা আসে দেখার জন্য। কিন্তু অনেক রাত হয়ে যেত, তবু প্রতিমা আসত না। ঘুমে চোখ ঢলে আসত। এক সময় ঠাকুমা এসে সরিয়ে নিয়ে যেত জানলার কাছ থেকে। বলত— 'অখন শুইয়া পড় সোনা। মাইনষে জাইগ্যা থাকলে ঠাকুর মর্ত্যে আসে না। সক্কলে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তহন আসে। অহন ঘুমাও। কাইল সকালে উইঠ্যা দেখবা ঠাকুর আইয়া পড়ছে।' একবার পুজোর মুখে মুখে পরেশনাথ মন্দিরের উল্টোদিকের খেলনার দোকান থেকে ঠাকুমা আমার জন্য একটা কাঁচের হাঁস কিনে এনেছিলেন। অনেকদিন ওটা সাজানো ছিল। হাত থেকে পড়ে ওটা ভেঙে যাওয়ার পর খুব কষ্টও পেয়েছিলাম মনে মনে।

ষষ্ঠীর দিন ভোরবেলা ঠাকুর আসার খবরটা প্রথম দিত দিদি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে কানে কানে বলত— 'ভাই, প্যান্ডেলে ঠাকুর এসে গেছে। দেখতে যাবি না?' তড়াক করে বিছানায় উঠে বসতাম। বলতাম— 'সত্যি?'

—'হ্যাঁ রে সত্যি। অনেক রাতে ঠাকুর এসেছে। তুই তো তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলি। বল দুর্গা মাইকি জয় বলতে বলতে ঠাকুর নিয়ে এল। কী বড়ো ঠাকুর রে ভাই। তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না।'

—'আমাকে ডাকলি না কেন?'

—'ডাকতাম তো। মা না করল। বলল এখন তোকে ডাকলে আর বাকি রাত তুই ঘুমোবি না।'

দিদির হাত ধরে প্যান্ডেলে ছুটে যেতাম

ঠাকুরের মুখ দেখতে। আমরা ভাই-বোন অবাক হয়ে প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দিদি বলত— 'ভাই দ্যাখ, চোখদুটো ঠিক আসলের মতো, না?' আমি বলতাম— 'হ্যাঁ, আমাদের দিকে দেখছে দ্যাখ।'

—'আসলে রমেশ পালের ঠাকুর তো...'

—'রমেশ পাল কে রে দিদি?'

—'জানিস না, বড়ো বড়ো ঠাকুর বানায়। একেব্বারে মানুষের মতো লাগে।'

ওই শারদ প্রাতে প্রতিমার মুখ দর্শন করে বাড়ি ফেরার সময় দিদি বলত— 'জানিস তো আমি না ঘটে অনেক পয়সা জমিয়েছি।'

—'কী করবি পয়সা দিয়ে।'

—'বাহ্ রে, পুজোর সময় আচার কিনব না—'

—'আমাকে একটা লাট্টু কিনে দিবি?'

—'দেব। চার আনা দেব তোকে, কিনে নিস।'

আমাদের লালাবাগানের পাড়ার পুজোর পাণ্ডা তখন ছিল চারজন। চন্দনদা, ভোম্বলদা, স্বপনদা আর কালীদা। চন্দনদার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। দাদু বলত— 'মুক্তোর মতো।' চন্দনদা হাতে লিখে পুজোর নির্ঘণ্ট ঝুলিয়ে দিত প্যান্ডেলে। সেই দেখে আমরা বুঝতে পারতুম অষ্টমীর দিন কখন অঞ্জলি দিতে হবে। ভোম্বলদা ছিল গাঁটাগোট্টা। কম কথা বলত। ভোম্বলদাকে বেশ ভয় পেতাম আমরা। আমাদের ভাব ছিল স্বপনদার সঙ্গে। লাল রিবন কেটে ব্যাজ বানিয়ে স্বপনদা আমাদের জামায় আটকে দিত। বলত--- 'তোরা পুজোর ভলান্টিয়র। যে ভালো ভলান্টিয়ারি করবে, তাকে একটা প্রাইজ দেব।' সে প্রাইজ অবশ্য কোনোদিনই স্বপনদা দেয়নি আমাদের। শুধু ভলান্টিয়ার হিসাবে পুজোর কদিন ঠাণ্ডা লুচি আর বোঁদে খাওয়াত। আমি, বাপি আর দীপক বুকে ব্যাজ সেঁটে পুজোর কদিন পাড়ায় ভলান্টিয়ারি করতাম। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যেবেলাই নতুন জুতোর ফোসকা পড়ে যেত পায়ে। জ্বালা করত। লেংচে লেংচে ঘুরতাম পুজোর কদিন। তবু ওই ফোসকার ব্যথার ভিতরই আমাদের পুজোর আনন্দ লুকিয়ে থাকত।

অষ্টমী পুজোর দিন সকালে আমার মা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে ঠাকুর দেখাতে বেরত। গৌরীবাড়ি সর্বজনীন, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, হাতিবাগান সার্বজনীন হয়ে ওই পরিক্রমা শেষ হতো বাগবাজারে গিয়ে। মা বলত— 'বাগবাজারের প্রতিমা দর্শন না করলে পুজো সম্পূর্ণ হয় না।' আমরা দুই ভাইবোন অবাক বিস্ময়ে ওই বিশাল একচালার প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ধূপ আর ধুনোয় কখনো কখনো আচ্ছন্ন হয়ে আসত প্রতিমার মুখ। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, ওই মুখে আসলে আমারই মায়ের মুখের আদল মিশে নেই তো।

মনে আছে, একবার গৌরীবাড়ি সার্বজনীনের ঠাকুর দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দু-দুটো অসুর। মা-কে জিগ্যেস করেছিলাম— 'সব ঠাকুরের তো একটা অসুর। এখানে দুটো অসুর কেন?'

—'ওরা শুম্ভ আর নিশুম্ভ। দুজনকেই দুর্গা ঠাকুর বধ করেছিলেন।'

—'শুম্ভ আর নিশুম্ভের গল্প বল আমাকে।'

—'বলব। বাড়ি ফিরে চল। ঘুমোনোর আগে বলব।'

বাড়ি ফেরার পথে আমার স্কুল শিক্ষিকা মা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে শ্যামবাজারে মিষ্টির দোকানে ঢুকতেন। লুচি আর ছোলার ডাল খেতাম আমরা। আর খেতে গিয়ে প্রতিবারই আমার জামায় ছোলার ডাল পড়ত। দিদি ধমক দিত আমাকে। বলত— 'ঠিক করে খেতেও পারিস না। নষ্ট করলি তো জামাটা।' মা বকত না। হাসত। বলত— 'একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে ধুয়ে দেব। কিছু হবে না।' ওই লুচি আর ছোলার ডালের গন্ধের সঙ্গে আমার মায়ের শরীরের সুবাস মিশে থাকত।

এরকমই এক পুজোর দিন সকালে আমাদের লালাবাগানের বাড়িতে একজন আশ্চর্য মানুষ এসেছিলেন। কাজি সব্যসাচী। আমার বাবার বন্ধু। ঢিলেঢালা সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা হাস্যময় একটি মানুষ। কিন্তু মানুষটি যে কে, কী করে— তা জানতাম না। জানার ইচ্ছেও ছিল না অবশ্য সেই সময়। তবে ওই পুজোর দিন সকালে কাজি সব্যসাচী আসার পর বাবা একটা কাণ্ড করেছিলেন বটে। আমাদের সবাইকে ডেকে ঘরে জড়ো করলেন। তারপর বললেন--- 'কাজি, এবার তুমি বিদ্রোহীটা সবাইকে একটু শোনাও।' মনে আছে, ঠিক দু মিনিট চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন ওই মানুষটি। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলেন— 'বল বীর, বল উন্নত মম শির...' আমাদের শতাব্দী প্রাচীন বাড়ির প্রতিটি ইঁটে মন্দ্রিত হতে থাকল এক ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বর।

আমার বাবার কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা এই রকম নানা কাণ্ড ঘটিয়ে ফিরে যেতেন। আর একবার এরকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সে পুজোর ঠিক মুখে। মহালয়ার পর পর। সেবার পুজোর ঠিক আগে এক রবিবার সকালে এসে হাজির হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বাবার আর এক সুহৃদ। বাবা সবাইকে ডেকে পাঠালেন বসার ঘরে। বললেন, 'অজিত পুজোয় এবার একটা নতুন নাটক রেকর্ড করেছে। সেটা সবাইকে শোনাবে। নাও অজিত, শুরু কর।' কণ্ঠস্বরের জাদু নিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন নাটকটি পাঠ করতে শুরু করলেন— 'নানা রঙের দিন।' ওই বালক বয়সে আমি জানতামই না অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষটি কে? পরে, যখন বড়ো হয়েছি, এই নাটকটিই অজিতেশবাবুর কণ্ঠে রেকর্ডে শুনেছি, তখন বারে বারেই এক শরতের রবিবারের কথা মনে হয়েছে। আমার পুজোর গন্ধ ছুঁয়ে আছে ওই রবিবারের সকালটিকেই।

মন সত্যিই খারাপ হয়ে যেত নবমীর দিন। নবমীর দিন আমি, দীপক আর বাপি প্যান্ডেলের পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। রাতে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরেও কাঁদতাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিত ঠাকুমা। বলত— 'কাইন্দো না সোনা, কাইন্দো না। সামনের বছর দুর্গা ঠাকুর আবার ঠিক আইবো। মায়েরে কইয়ো— বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, মানুষ কর। কাইন্দো না।'

কালীদার গানের গলাটা খুব সুন্দর ছিল। সবাই বলত— হেমন্তর মতো। দশমীর দিন সন্ধেবেলা প্রতিমা ভাসানে চলে যাবার পর মণ্ডপে যখন একাকী একটি প্রদীপ জ্বলত, তখন ওই শূন্য মণ্ডপে বসে কালীদা গান ধরত— 'আমি হতে পারিনি আকাশ, তুমি দিনশেষে আলোর আবেশ নিয়ে চাঁদ হলে...।' আমার কাছে দশমীর সন্ধে মানে এখনো এক নিঃস্ব যুবকের হাহাকারে ভরে ওঠা গান।

আমাদের মানিকতলার পাড়ায় এখন থিমের ঠাকুর হয়। চন্দনদা ক্যান্সারে মারা গেছে। ভোম্বলদারা অনেক আগেই পাড়া ছেড়েছে। কালীদা এক শীতের রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। আমি এখনো বাটার জুতো কিনি। তবে মুখ ভোঁতা কালো স্কুল শু নয়। আধুনিক ডিজাইনের দামি জুতো। শুধু আমার পায়ে এখন আর ফোসকা পড়ে না। ■

এলাটিং বেলাটিং সই লো

সন্দীপ চক্রবর্তী

দেবী দুর্গাকে কেন সবাই মা দুর্গা বলে তখনও বুঝে উঠতে পারিনি। সেই দিনগুলো ছিল হাঁ করে তাকিয়ে থাকার। স্মার্ট হয়ে ওঠার বালাই ছিল না। কেয়া ছিল আমার সেই বয়েসের বন্ধু। ওকে বাদ দিয়ে পুজোর কথা ভাবতেও পারতাম না। সন্ধ্যেবেলায় পুজোর ভিড়ে বেরনো নিষেধ। তাই আমরা বেরোতাম সকালে। কেয়া একদিন বলল, 'দুর্গা আমাদের পিসিমা। কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী আমাদের পিসতুতো দাদা দিদি।' দেবী যদি মা না হন তাহলে পিসিমাই বা হবেন কেন? এ প্রশ্ন সেদিন মাথায় আসেনি। কেয়ার যুক্তি অমোঘ বলে মনে হয়েছিল। এরপর দুজন মতিচ্ছন্ন বালক-বালিকার পিসিমা হয়ে উঠতে দেবী দুর্গার আর বিশেষ দেরি হয়নি।

যে শহরে আমি থাকি, আমার ছেলেবেলায় সেটি ছিল আগাগোড়া মফস্সল শহর। এখন যেমন রাস্তায় নানা রঙের আলো জ্বলতে দেখা যায় তখন সেরকম ছিল না। আন্দাজ একশো মিটার অন্তর একটি করে ল্যাম্পপোস্ট। অধিকাংশের বাল্‌ব হয় কাটা নয়তো দেশি মদের দোকানের সুবিধার্থে অদৃশ্য। সামান্য আলো এবং গভীর অন্ধকারে হাঁটার সময় নিজেকে ছায়ামূর্তি বলে মনে হতো। দুনিয়ার সব ভূত যেহেতু নিরীহ বালকদেরই আক্রমণ করে থাকে, তাই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কখনও মায়ের হাত ছেড়ে হেঁটেছি বলে মনে পড়ে না। সুতরাং এই পরিবেশে দুর্গাপুজো যে শুধু পুজো থাকবে না, এমনকী স্রেফ উৎসবও না— সে কথা বলাই বাহুল্য। দুর্গাপুজো ছিল আমাদের কাছে জীবনদায়ী ওষুধের মতো। যে ওষুধ খেয়ে জীবনযুদ্ধে অর্ধমৃত মানবসমাজ ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠত। যাদের মুখে কখনও হাসি দেখিনি তারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠত পুজো নামক পরশপাথরের স্পর্শে। রানুপিসির কথাই ধরা যাক। আমাদের পরিবারের কেউ নয়। অথচ অকালবিধবা রানুপিসির প্রতি আমার অসম্ভব টান। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকত বাড়ির চৌকাঠে। আগেই বলেছি আমি ছিলাম হাঁ করা ছেলে। রানুপিসির সাদা শাড়ি আর খোলা চুল আমার বিশ্রী লাগত। একদিন বেমালুম জিজ্ঞেস করে বসলাম, তুমি সাদা শাড়ি পরো কেন? সেদিন রানুপিসির চোখে জল দেখেছিলাম। দিনটা ছিল দেবীর বোধনের। ইচ্ছে হয়েছিল বলি, আমাদের বাড়িতে অনেক রঙিন শাড়ি আছে। তোমাকে দিলে তুমি পরবে? কিন্তু লজ্জায় বলতে পারিনি। রানুপিসির সেই অমলিন বিষাদের ছায়া পড়েছিল পরবর্তীকালে লেখা আমার এক কবিতায়—

খুব কাছে আমি যাই না কারোর কখনও
ব্যবধান রেখে দাঁড়ালে
গিঁট খুলে রেখে চলে যেতে পারি সহজে
কোনও পিছুটান ব্যাকুল করে না,

দূরে দূরে পা বাড়ালে।... (দূরে দূরে পা)

আমার কেয়ার প্রসঙ্গে ফিরব। কেয়া ছাড়া আমার ছোটোবেলা ভীষণই বিবর্ণ। একবার পুজোয় খুব বৃষ্টি। কেয়া বলল, 'চল আমরা চিলেকোঠার ঘরে খেলব।' প্যান্ডেলের মাইকে বাজা মান্না দের গান অগ্রাহ্য করে ছুটলাম চিলেকোঠায়। শুরু হলো খেলা। প্রথমে ছড়া কাটা, এলাটিং বেলাটিং সই লো, মনের কথা কইলো।... তারপর কিছুক্ষণ কুমিরডাঙা, ভাতচাবি। শেষে নির্ভেজাল পুতুল খেলা। দুটি মাত্র পুতুল। একটি পুরুষ অন্যটি মহিলা। কেয়া পাত্রীপক্ষ আর আমি পাত্রপক্ষ। তখনও বরপণ বলে জিনিসটার কথা জানতাম না। আট বছরের কেয়া আমায় শিখিয়েছিল, 'দ্যাখ তুই দশ হাজার টাকা নগদ আর দশ ভরি সোনার গয়না চাইবি, বুঝলি?' বুঝলাম, কিন্তু ভরি কী, নগদই বা কাকে বলে? কেয়া অবাক হয়ে বলল, 'এটাও জানিস না! মা দুর্গার এক-একটা হাতে যত সোনা ধরে তাকে বলে ভরি। দশ হাতে যত সোনা ধরে সেটাই হলো দশ ভরি।' অসামান্য যুক্তি! কিন্তু নগদ কাকে বলে? দুর্ভাগ্য, কেয়া সেটা জানত না। আমারও ততক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। টের পেয়েছি বৃষ্টি কমেছে। সুতরাং পুতুলের বিয়ে আপাতত স্থগিত রেখে, দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে, রাস্তার জমা জলে স্নান করে এবং করিয়ে একেবারে দেবীর সামনে। আমার পিছনে কেয়া। সেদিন মনে হয়েছিল দেবী আমাদের ওপর খুব রেগে গেছেন। পুজোর সময় প্যান্ডেলে না থেকে আমরা আবোলতাবোল খেলায় মেতেছিলাম, অপরাধ তো কম নয়। সুতরাং সেদিনই মাতৃসম্বোধন। কী বলেছিলাম আজ আর মনে নেই। তবে সাত বছরের অপরাধী বালকের আত্মসমর্পণে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না, সেকথা হলপ করে বলতে পরি।

ছেলেবেলায় পুজোর নতুন জামা-জুতো নিয়ে সকলেরই একটা উন্মাদনা থাকে। আমারও ছিল। কোনটা কবে পরব সব আগে থেকে ঠিক করে রাখতাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নতুন জামা-প্যান্ট আমাকে আনন্দ দিলেও বিস্মিত করতে পারেনি। হাঁ করা ছেলেদের প্রধান খোরাক ওইটা— বিস্ময়! এমন কোনও ঘটনা চাই যা আমার কল্পনাকে সজীব করে দেবে। এবং মনে মনে আমি ওই ঘটনার নায়ক হয়ে উঠব। একটু খোলসা করেই বলি।

আমাদের বাড়ির কাছেই কেশববাবুদের বাড়ি। পুরনো জমিদার বংশ। বিশাল বাড়ি, হাতির পায়ের মতো এক-একেকটা থাম, গা-ছমছমে নাটমন্দির এবং থামের ওপর চওড়া চাতালে অসংখ্য পায়রা। না, আমার বিস্ময় পায়রার কারণে নয়। এমনকী কেশববাবুদের প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়া বিশাল জমিদার বাড়ি দেখেও নয়। আমার বিস্ময় ওদের বিশাল ঠাকুরদালানে ঠাকুর গড়া দেখে। সে যে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা যারা ছোটোবেলায় ঠাকুর গড়া দেখেননি তারা বুঝবেন না। কিন্তু ঠাকুর গড়া দেখে আমি কি শুধু আনন্দই পেয়েছি? না, তা নয়। আমার মনে হতো আমি যদি ঠাকুর গড়তাম, যদি চোখ আঁকতে পারতাম তাহলে মা আরও সুন্দর হতেন। মূর্তি গড়তেন অঘোর পাল। মাথা ভর্তি সাদা ধবধবে চুল। চোখে চশমা। আমরা ছোটোরা ডাকতাম অঘোরদাদু বলে। একদিন মনে অসীম সাহস সঞ্চয় করে কাছে গিয়ে বলেছিলাম, 'আমাকে ঠাকুরের চোখ আঁকতে দেবে অঘোরদাদু?' আমাকে সস্নেহে আরও কাছে টেনে নিয়ে অঘোরদাদু বলেছিলেন, 'আগে চোখ ফুটুক তারপর চোখ আঁকবে দাদুভাই।' সেদিন একথার মানে বুঝিনি। পরে বুঝেছি। একটা গল্পও লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম, চোখ। গল্পে আমারই মতো একটা ছোটো ছেলে দেবীর চোখ আঁকতে চেয়েছিল। শিল্পীর অনুপস্থিতিতে একদিন এঁকেও ফেলে। সেই ট্যারাবাঁকা চোখ দেখে ক্ষুব্ধ ছেলেটির জ্যাঠামশাই উত্তম মধ্যম দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বড়ো হয়ে কী হবে, পোটো? ভাত জুটবে তাতে?' ছেলেটি কোনও উত্তর দেয়নি। তবে বড়ো হয়ে পোটোই হয়েছিল। খুব ভালো চোখ আঁকত। কিন্তু শেষজীবনে অন্ধ হয়ে যায়। গল্প বেরনোর পর গিয়েছিলাম অঘোরদাদুর বাড়িতে। তখন ওর আরও বয়েস হয়েছে। মূর্তি আর গড়েন না। শুধু চোখে আঁকেন। গল্প পড়ে খুব খুশি। আমায় আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'চোখ ফুটে গেছে দাদুভাই। কোনও কিছুর জন্য এই চোখ নষ্ট করো না।'

গ্রামের পুজো আমি বিশেষ দেখিনি। শুধু একবার পুজোর দু'চারদিন আগে গিয়েছিলাম তাজপুরে। আমার দাদু প্রসাদ চক্রবর্তী ওখানে থাকতেন। আমাদের আদি বাড়িও ওখানে। আমাকে বসতে বলে দাদু অন্য কী একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। কারণ আসার সময় দেখে এসেছি দামোদরের পাড়ে ম্যারাপ বেঁধে মূর্তি গড়া চলছে। ওখানে আমায় যেতেই হবে। এক সময় দাদুর হাত ছাড়িয়ে গেলামও। আর যাওয়া মাত্র এক আশ্চর্য রঙিন রূপকথার পৃথিবীর দরজা আমার চোখের সামনে খুলে গেল। আকাশ এমন নীল হয় জানতাম না। আর আদিগন্ত নীলের এই প্রেক্ষাপটে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা সাদা রঙের ওগুলো কী ফুল? উত্তর দিয়েছিল তাজপুরে আমার বাল্য সহচর ভানু, 'ওগুলো কাশফুল।' আর আমাকে পায় কে! ঠাকুর গড়া দেখার রোমাঞ্চ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম কাশফুলের কাছে। অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম ঘাসের ওপর। দামোদরের হাওয়ায় আমার কপালে লুটিয়ে পড়া কাশফুলের সেই স্পর্শ এখনও আমি ভুলিনি।

বাড়ির কাছে তখন একটাই পুজো। আমার ছেলেবেলার পুজোর বেশিরভাগ সময় কেটেছে ওখানেই। সারাদিন শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক কিন্তু সন্ধ্যে হলেই নতুন জামা প্যান্ট জুতো পরে আর হাতে খেলনা পিস্তল নিয়ে পুরোদস্তুর জেমস বন্ড! ক্যাপ ফাটানোর শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। উপদ্রব করার জন্য বকা কিছু কম খাইনি। ছেলেদের এইসব খেলায় যোগ দিত কেয়াও। ওকে ক্যাপ ফাটাতে, ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছি। এমনকী ওর গুলি খেলার হাতও ছিল অসাধারণ।

খুব মিস করি সেই দিনগুলো। ইচ্ছে হয় দামোদরের পাড়ে ছুটে যাই। শুয়ে থাকি ঘাসের ওপর। কেশববাবুদের ঠাকুরদালানে গিয়ে ঠাকুরগড়া দেখি হাঁ করে। আর নয়তো কেয়াকে ডাকি, এলাটিং বেলাটিং সই লো... কিন্তু সাড়া দেবার লোক কোথায়? আমার ছেলেবেলা কোনওদিন না ফুরোলেও কেয়াদের তো ফুরোয়। ও কী করে বুঝবে এখনও ঠাকুর গড়ার সময় একটা ছেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যতদিন দুর্গাঠাকুর থাকবেন ওই ছেলেটাও থাকবে। এই ছবি পুরনো হবে না কিছুতেই। ■

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দোরগোড়ায় নীরজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জুনিয়রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, সিনিয়রে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী। এবার তার লক্ষ্য সিনিয়রে বিশ্বসেরা হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করা। হরিয়ানার যুবক নীরজ চোপড়ার জীবনটাই যেন রূপকথা। ধাপে ধাপে স্বপ্নপূরণের পাদটীকা যেন। ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের এই 'ব্লু আইড বয়' খোলমেলা সাক্ষাৎকারে যেন 'ডন জুয়ান'।

□ এত ইভেন্ট থাকতে জ্যাভেলিনে কেন এলেন?

নীরজ : অল্পবয়স থেকেই অ্যাথলেটিক্স ভালো লাগত। আর মাঠে এসে সব সময় ভারি ভারি কাজ করতে উৎসাহ পেতাম। স্কুলের মিটে একদিন গেম টিচার আমার হাতে পুঁচকে জ্যাভেলিন ধরিয়ে বললেন, যাও দেখি কতদূর ছুঁড়তে পার। সেই শুরু, উৎসাহ বেড়ে গেল। নিজের শক্তিমত্তা জাহির করবার উৎকৃষ্ট মাধ্যম এই বর্শাকে যতদূর সম্ভব নিক্ষেপ করা। আর হরিয়ানায় অ্যাথলেটিক্সের খুব কদর। ভর্তি করে দেওয়া হলো সাই কেন্দ্রে। আধুনিক জ্যাভেলিন হাতে পেলাম, সঙ্গে উন্নত কোচিং সিস্টেম। জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললাম জ্যাভেলিনকে।

□ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে না যেতে পারার কোনও যন্ত্রণা?

নীরজ : এর আগে ২০১৭ লন্ডন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছি। পদক পাইনি। এবছর যেরকম কন্ডিশনে ছিলাম, আশা ছিল দোহা বিশ্বমিটে পোডিয়াম ফিনিশ করব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক পেলে এ দেশের থ্রোয়িং ইভেন্টের চালচিত্রটাই বদলে যেত। সাইয়ে নিবিড় অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, নিজেকে। গত আগস্টে জাকার্তা এশিয়াডে সোনার পদক (এশিয়ান রেকর্ড-সহ) পাওয়ার পর মনে হয়েছিল সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে দোহা বিশ্ব ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে আমার ইভেন্টে এবার বড়ো মাপের সাফল্য আসতে চলেছে। কিন্তু মাসতিনেক আগে অনুশীলনে পাওয়া চোটটাই সব আশা শেষ করে দিল। সমস্তরকম রিহ্যাব করিয়ে সুস্থ হতে পারলাম না। এবার আমার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক পাওয়ার দারুণ সম্ভাবনা ছিল।

□ এই দুঃসময়ে কীভাবে নিজেকে মোটিভেট করছেন?

নীরজ : অ্যাথলেটিক্স হচ্ছে জীবনের কঠিনতম সাধনার বিষয়। জগতে যতরকমের কাজ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য কঠিন চর্চা এবং অবশ্যই প্রকৃতিপ্রদত্ত যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এক মাধ্যম। একদিনও মাঠে আসতে না পারলে মনে হয় প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনচর্চায় ছেদ পড়ে গেল। কিন্তু চোট-আঘাত এই ইভেন্টের আবশ্যিক অঙ্গ। এই সত্যটাকেও মেনে নিতে হবে। দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক অ্যাথলিটের জীবনেই এই ঘটনা ঘটেছে। তা মেনে নিয়ে তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। অনেকেই সফল হয়েছে পরে ফিরে এসে। আমিও পারব। মুম্বাইতে যে ধরনের চিকিৎসা ও রিহ্যাব-কন্ডিশনিং ট্রেনিং করে যাচ্ছি তা ব্যর্থ হবে না। আর যখনই সময় পাই সব ধরনের গান শুনি। বহু পঞ্জাবি তারকা মিউজিশিয়ান আমার পরিচিত। তাদের গান-বাজনা শুনি। হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করি। এর থেকেই ইতিবাচক তরঙ্গের সঞ্চার হয় দেহ-মনে। আর প্রতিদিন নিয়মিত যোগ-প্রণায়াম অভ্যাস করি। মিউজিক এবং যোগাভ্যাস আমাকে প্রাণশক্তিতে ভরপুর রেখেছে এই কঠিন সময়ে।

□ এই পিরিয়ডে পরিবারকে কতটা পাশে পেয়েছেন?

নীরজ : এই দীর্ঘ সময়ে আমার পুরো পরিবার বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য পুরোমাত্রায় উপভোগ করেছি। মাসের পর মাস আমাকে হয় ট্রেনিং সেন্টারে নয় বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক আসরে কাটাতে হয়। ভগবানের আশীর্বাদে এই চোটজনিত বিশ্রামটাই আমাকে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার, দীর্ঘসময় কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তারা আমাকে সব সময় উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়ে যাচ্ছে। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাকে আবার দূর ট্রাকে ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই সাহায্য করবে। সর্বোপরি বিশ্রামে থাকার সুবাদে অনেক বেশি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছি টিভি ও খবরের কাগজের মাধ্যমে। সেই অনুযায়ী নিজের ভাবনা-চিন্তাকে এক ফ্রেমে গুছিয়ে নিতে পারছি।

□ ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যত সম্পর্কে অভিমত?

নীরজ : অনেকদিন পর ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স আবার একটা জমাট রূপ পেতে চলেছে। গত এশিয়াডই তার প্রমাণ। বিদেশে আজ পর্যন্ত কোনো এশিয়াডে এত পদক পায়নি ভারত। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এবং সরকারি সাইসংস্থা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধে প্রদান করছে। ভালো মানের বিদেশি কোচ— ট্রেনার সুষম খাদ্য, বিদেশে অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা তার সঙ্গে পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক এক্সপোজার সহযোগে এদেশের অ্যাথলেটিক্সের মান ও মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি নিজে ভুক্তভোগী এই সব সুযোগ সুবিধে পাওয়ার ক্ষেত্রে। এখন এশিয় পর্যায়ে ভারত আবার বড়ো শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে। ঠিক যেমন ৭০-৮০-র দশকে ভারতীয়রা রাজত্ব করত এশিয় ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে। তবে বিশ্বপর্যায়ে আরও ওপরে যেতে হলে এর সঙ্গে আরও বিশেষ কিছু অনুষঙ্গের দরকার। যা অদূরভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়। ■

লোভী রাজার শিক্ষা

প্রাচীনকালে ইউরোপে গ্রিসদেশে মিডাস নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজা মিডাসের ছিল সোনার প্রতি ভয়ানক লোভ। নিজের ছেলে-মেয়ে ছাড়া শুধু সোনা ভালোবাসত। তার মনে হতো সোনা চাই,

আরও আরও। রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে সোনারই স্বপ্ন দেখতেন। একদিন রাজা তাঁর ধনাগারে সোনার ইট, অলংকার, গিনি সব গুনে গুনে দেখছিলেন, তখন হঠাৎ এক দেবদূতের আবির্ভাব হলো সেখানে। দেবদূত রাজাকে বললেন--'মিডাস, তুমি তো খুব ধনবান দেখছি।' মিডাস উত্তর দেয়– 'আমি আর ধনবান কোথায়? আমার কাছে তো অতি সামান্য সোনা আছে।' দেবদূত বললেন– 'অত সোনা থাকতেও তুমি অভাববোধ করছ? তোমার কত সোনা দরকার আমোকে বল।' মিডাস বললেন,আমি চাই অনেক আরও অনেক সোনা। যাতে হাত দেব তাই যেন সোনা হয়ে যায়।' দেবদূত হেসে উঠে বললেন-- 'আচ্ছা, তাই হবে। আগামীকাল সকাল থেকে তুমি যেটাই স্পর্শ করবে সেটাই সোনা হয়ে যাবে।' এই বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন রাতে মিডাসের চোখে ঘুম এল না। খুব সকালে বিছানা থেকে উঠেই সে একটা চেয়ারে হাত দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা সোনার হয়ে গেল। তারপর টেবিলে হাত ঠেকালেন, সেটাও সোনার হয়ে গেল। রাজা মিডাস খুশিতে ফেটে পড়লেন। তিনি আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলেন। তারপর পাগলের মতো নাচতে নাচতে বাগানের দিকে ছুটে গেলেন। সেখানে তিনি এক একটা গাছে হাত ঠেকানো মাত্রই তা সোনার হয়ে যেতে লাগল। সব জিনিস চক চক করতে লাগল। এত সোনা দেখে আনন্দে তাঁর বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো।

চারিদিক ছুটে বেড়িয়ে রাজা হাঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর এতক্ষণ খেয়াল হয়নি যে, তাঁর পরনের পোশাক পর্যন্ত সোনা হয়ে ভারী হয়ে গিয়েছে। এবার তাঁর ক্ষুধা আর পিপাসা অনুভব হলো। বাগান থেকে তিনি দৌড়ে মহলে ফিরে এসে একটা সোনার চেয়ারে বসলেন ও খাবার দেবার হুকুম করলেন। একজন পরিচারিকা তখনই খাবার ভর্তি থালা আর জলের গেলাস তাঁর সামনে রাখল। কিন্তু যেমনি মিডাস খাবারে হাত দিয়েছেন অমনি সব খাবার সোনা হয়ে গেল। জলের গেলাসে যেমনি হাত দিয়েছেন জল ও গেলাস দুইই সোনা হয়ে গেল। মিডাসের সামনে সোনার রুটি, সোনার ভাত, সোনার ব্যঞ্জন সোনার জল সাজানো রয়েছে কিন্তু তিনি কিছুই খেতে পারছেন না। ক্ষুধা ও তৃষায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন, সোনায় তো আর ক্ষুধা তৃষা মিটবে না।

মিডাস কাঁদতে লাগলেন। সেসময় তাঁর ছোটো মেয়েটি বাবার কান্না দেখে দৌড়ে গিয়ে রাজার কোলে উঠে চোখের জল মোছতে গেল। রাজাও মেয়েকে বুকে চেপে ধরতে গেলেন। কিন্তু হায় রে, মিডাসের কোলে তখন মেয়ে একটা সোনার ভারী পুতুলে পরিণত হয়ে গেছে। বেচারা মিডাস মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলেন আর বলছেন আর তাঁর সোনা চাই না, সোনা চাই না।

দেবদূত আবার ফিরে এলেন। বললেন, মিডাস, আর সোনা চাই তোমার? বলো এক গেলাস জল মূল্যবান না সোনা? এক টুকরো রুটি না সোনা? মিডাস হাত জোড় করে বললেন– 'আমার আর সোনা চাই না। আমি বুঝতে পেরেছি সোনা মানুষের কাছে আবশ্যক বস্তু নয়। সোনা না থাকলে মানুষের কাজ আটকায় না কিন্তু জল ও রুটি ছাড়া মানুষের কোনোভাবেই চলবে না। আমাকে দেওয়া বর আপনি ফিরিয়ে নিন।'

দেবদূত মিডাসকে এক বাটি জল দিয়ে বললেন– এই জল সব জিনিসের উপর ছিঁটিয়ে দাও। মিডাস সেই জল সব জিনিসের ওপর ছিঁটিয়ে দিতেই সেগুলি আবার আগের মতো হয়ে গেল। মিডাস হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর জীবনে কোনোদিন লোভ করেননি।

–শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের পথে পথে

শাকম্ভরী তীর্থ

অতীতের মায়ারাষ্ট্রের বর্তমান নাম মিরাট। মন্দোদরীর পিতা মায়ার হাতে এই শহরের পত্তন হয়। এই শহর থেকেই যেতে হয় শাকম্ভরী তীর্থে। শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা আরণ্যক পরিবেশে দেবী শাকম্ভরী মন্দির। একান্ন পীঠের একটি পীঠ শাকম্ভরী তীর্থ। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর মস্তক এখানে পড়ে। বর্তমান মন্দিরটি পরে তৈরি হয়েছে। কথিত, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এখানে মন্দির গড়েন। বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী গিরি। শাকম্ভরী তার্থের স্থানীয় নাম ত্রিশূলা তীর্থ। আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্দশীর মুখ্যযোগে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসে দূরদূরান্ত থেকে। দোল পূর্ণিমা ও চৈত্র শুক্লা চতুর্দশীতেও বড়ো মেলা বসে। এছাড়া কাছেই রয়েছে আরও নানান মন্দির। পাহাড়ের শীর্ষে রয়েছে দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির।

জানো কি?

কয়েকজন মহাপুরুষের জন্মস্থান

- গুরু নানকদেব—পশ্চিম পঞ্জাব, পাকিস্তান।
- স্বামী রামতীর্থ —পঞ্জাব।
- সন্ত জ্ঞানেশ্বর—মহারাষ্ট্র।
- সমর্থ রামদাস—মহারাষ্ট্র।
- নরসী মেহতা—গুজরাট।
- স্বামী দয়ানন্দ—গুজরাট।
- সন্ত ঝুলেলাল—সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান।
- সন্ত বসবেশ্বর—কর্ণাটক।
- স্বামী দয়ানন্দ—গুজরাট।
- শঙ্করদেব—অসম।
- আদি শঙ্করাচার্য—কেরল।

ভালো কথা

পুজোর সংকল্প

আমাদের পাড়ায় আমরা ২০ জন মিলে ছ'মাস আগে 'স্বচ্ছতা বাহিনী' তৈরি করেছি। এমনিতেই আমরা মাসে একদিন গ্রাম সাফাই অভিযান করি। তাতে বড়োরাও অংশ নেয়। এবার আমরা ঠিক করেছি পুজোর চারদিন সবসময় বাহিনী রেডি থাকবে। পাঁচজন করে দল তৈরি হয়েছে। দু'ঘণ্টা করে সারা পাড়া ঘুরে ঘুরে দেখবে কোথাও কোনো আবর্জনা জমেছে কী না। আবর্জনা দেখলেই তা কুড়িয়ে গ্রামের বাইরে গর্ত করে মাটি চাপা দেবে। সুধীর জেঠু বলেছেন– নিজে এবং পরিবেশ পরিষ্কার না রাখলে মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, এমনকী শিবঠাকুরও সদয় হন না। শুধু শুধু ঘটা করে পুজো করলে তো হবে না, যাঁর পুজো করছি তাঁকে সদয় করা দরকার। তাই সারা বছর পরিষ্কার থাকতেই হবে আর পুজোর সময় আরও বেশি থাকতে হবে। এটাই আমাদের এবারের পুজোর সংকল্প।

নন্দিতা চক্রবর্তী, নবম শ্রেণী,বেলিয়াতোড, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ধি র্মা ক ণ ধ	(১) তি কৃ ক মি প্রে প্র
(২) প ন্দি দ ন নী	(২) না নী বি য় সে জ

১৯ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) হিমালয় (২) রামসেতু

১৯ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) পালটাপালটি (২) ফুসুরফুসুর

উত্তরদাতার নাম

(১) টিংকু মণ্ডল,বরুণা, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর। (২) কুন্তল দাস, সাহাপুর, মালদা। (৩) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (৪) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৮।।

রাতে বিপ্লবীরা গোপান আস্তানায় বোমা তৈরি করতেন।

আজ এখানেই শেষ করা যাক।

অনেক রাত হয়ে গেছে

তারপর সবাই সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে। নীচের সিঁড়িতে শুয়ে ছিল এক গুপ্তচর। শব্দ পেয়ে পালাতে গেল সে।

ধর, ধর গুপ্তচরটাকে।

সবাই চারিদিক থেকে লোকটাকে ঘিরে ফেলল।

ওকে আমরা বন্ধু করে নেব। ওকে মেরো না।

১৯১৩ সালে মেদিনীপুরে প্রবল বন্যা হলো। কেশব নিজের বন্ধুদের সঙ্গে করে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে।

আহা! এমন সব যুবকই তো আজ দেশের প্রয়োজন।

আমরা সেবার কাজ করতে চাই।

ক্রমশ

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়

ডাঃ আর এন দাস

সত্তরের দশকে আমিও নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। আজ পরিণত মস্তিষ্কে সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। কারণ দেখেছি, ৮৭ সালের পর থেকে কীভাবে দেশের জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এটা কংগ্রেস আর সিপিএমের বদান্যতায় হয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটের ভিখারিদের 'ভোটব্যাঙ্ক' পলিটিক্সের কারণে! সীমান্তবর্তী সমস্ত (৯/১৮) জেলাগুলিতে বাংলাদেশি অসংখ্য মুসলমানের অবৈধ অনুপ্রবেশ, ভোটার, আধার আর রেশন কার্ডের সাহায্যে তারা যে আগামী ৫০ বছরে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের সৃষ্টি করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

সমস্ত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় কমিউনিস্টদের অফিসঘর থাকে যেমন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের। হিন্দু পূজামণ্ডপের বাইরে লালশালুতে মোড়া প্যান্ডালে মার্কসীয় সাহিত্যের বিক্রি! অর্থাৎ যত কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যেই আছে, অন্য ধর্মে নাই। কমিউনিস্টরা বলে, সন্ত্রাসীদের নাকি কোনো ধর্ম হয় না! ভালো কথা, তবে সন্ত্রাসীদের মৃতদেহ কেন কবর দেওয়ার জন্য আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? সন্ত্রাসীদের বিশ্বাস জেহাদ করে মরলে, তারা নাকি কবরের মধ্যে বেঁচে উঠে সোজা বেহেস্তের 'ফিরদৌসে' পৌঁছে যাবে, যেখানে ৭২ জন 'হুরী'র সঙ্গে অনন্তকাল ধরে যৌনসম্ভোগে দিন কাটাবে। তাই সরকারের উচিত এদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা। যাতে কবর থেকে বেঁচে ওঠার অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত হতে পারে। বেহেস্তের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভাবনায় মোমিনরা আর আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে চাইবে না!

কমিউনিজম যে আসলে মানসিক বিকৃতিরই আর একটি নাম তা কাশ্মীর হামলা নিয়ে এদের বিভিন্ন বক্তব্য শোনার পর আরও বেশি প্রতীয়মান হয়। ইসলামিক জিহাদকে এরা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নাম দিয়ে আসল সত্য আর তথ্যটাকে আড়াল করতে চায়। সন্ত্রসবাদীরা তো নিজেরাই একে ইসলামিক জিহাদ বলে

চীনের ডিটেনশন ক্যাম্পে উইঘুর মুসলমানরা।

স্বীকার করে! বামেদের নয়নের মনি 'বুরহান ওয়ানি', নিজেই ভিডিও করে প্রচার করেছিল, 'শুধু কাশ্মীর নয়, সারাবিশ্বে ইসলামিক জিহাদ ততদিন পর্যন্ত চালু থাকবে যতদিন না সমস্ত মালাউন আর মুশরিকদের কোতল করে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ হবে এবং ইসলামিক খিলাফত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে'।

বামেদের কাছে সম্প্রদায় ভেদে, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা পালটিয়ে যায়? জে এন ইউ-এর কানহাইয়া কুমার অনির্বাণ ভট্টচার্য, শাহেলা রসিদ আর উমর খালিদ, যাদবপুরের দেবাঞ্জন বল্লভ ও তার মদতদাতারা— এরা সবাই কিন্তু কমিউনিজমের আড়ালে ইসলামিক জিহাদ চালাচ্ছে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে জানতে পারবেন!

কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত সারাজীবন ধরে সিপিআই-এর হয়ে 'কমিউনিজমের তত্ত্ব' আওড়িয়ে, জীবনের শেষ সন্ধ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেন এক তালাকপ্রাপ্তা মুসলমানকে নিকা করে। কট্টর হিন্দু-বিরোধী হিসাবেই জ্যোতিবাবুকে সবাই জানেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী তাঁর জন্য নিয়মিত ভাবে কালীঘাটে পূজা দিতেন। সোমনাথবাবু বা জ্যোতিবাবুর শেষকৃত্যও কিন্তু হিন্দুমতেই হয়েছিল। অর্থাৎ ইহকালে বেঁচে থাকার জন্য কমিউনিজমের বুলি, আর পরকালের আসন পাকা করার জন্য হিন্দু-সংস্কারের নামাবলী। মনে পড়ে, কীর্তিমান বাম 'কর্মী'দের আনন্দমার্গী ও সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড, অনিতা দেওয়ান আর তাপসী মালিকের ধর্ষণের কথা? এদের বিপ্লবের নামই তো সন্ত্রাস। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র হামলা সেটাই আবার প্রমাণ করলো।

এরপরও কি আমরা কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদকে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাধীনতার লড়াই বলব? এটা যে ইসলামিক

ফঃ ৬

জিহাদ, সেই কারণেই তো দেশবিদেশের মুজাহিদিনরা কোরানের আয়াত মুখস্ত করে, একজোট হয়ে, ৭২ হুরির স্বপ্নিল কল্পনায় বিভোর হয়ে আত্মঘাতী হামলায় অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে, ১০ বছরের রীনাকে ৪/৫ জন মিলে ধর্ষণ করে মেরে ফেলার সময়, তাকে কোরানের আয়াত শোনান হয়েছিল। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' পড়ুন! হিন্দুর সে সৎ সাহসই নেই যে সেই বইটা পড়বে! ইংল্যান্ডের 'রদারহাম' শহরে অনাথা আশ্রয়ালয়ের কিশোরী মেয়েদের ওপর পাকিস্তানি মুসলমানরা এই যৌনশোষণ একদশক ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি তার কেস চলছে কোর্টে। একইভাবে, ফ্রান্সের কুখ্যাত ও বহুচর্চিত 'তারিক রামাদানে'র কেসটা সেইজন্য ফ্রান্সের ফেডেরাল কোর্টে উঠেছে।

এটা যদি কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই হতো, তবে কাশ্মীরি হিন্দুপণ্ডিত বা বৌদ্ধরা কেন এতে শামিল হচ্ছেন না? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে লড়াই করেছিল। সেখানে ভারতের পতাকা উড়েছিল কি? কিন্তু কাশ্মীরে কেন পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে? জঙ্গির মৃতদেহ কেন মুড়ে দেওয়া হয় আইসিসের পতাকায়? কমিউনিস্ট বন্ধুরা জবাব দিন। যদি কাশ্মীর আলাদা হয়, কী হবে তার ধর্মীয় পরিচয়? ধর্মনিরপেক্ষ নাকি ভারতকে টুকরো করে আরও একটা ইসলামিক দেশের জন্ম হবে? পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে পাকিস্তান। এখন উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে কেরলে স্থাপন হবে আরও একটি করে মুসলমান দেশ। তারপর ভারতকে ১৬টি ছোটো অংশে ভাগ করে প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ হিন্দু শিখ পুরুষকে হত্যা করে এবং ততোধিক সংখ্যায় হিন্দু নারীকে ধর্ষণের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করিয়ে সেক্সস্লেভ করে রাখা হবে যা হতো মুঘল হারেমে! অধিকৃত কাশ্মীরে হিন্দু ও বৌদ্ধদের অবস্থা তখন কী হবে? মায়ানমারকে কেটে রাখাইন প্রদেশ বানানোর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলছে যেমন ফিলিপিন্সের দক্ষিণভাগ কেটে আরও একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের বলি দিয়ে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হলে কিন্তু দেশটি ইসলামিক দেশে পরিণত হলো। অন্যদিকে, ভারতকে কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র বলা চলবে না যদিও এখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে! ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মপরিবর্তন করার ষড়যন্ত্র চালু রাখতে হবে যতদিন না মুসলমানদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ পৌঁছিয়ে যায়।

সাধারণ একটি প্রশ্ন জাগে মনে! যেখানেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হয়, সেখানেই কেন বিচ্ছিন্নতাবাদ আর সন্ত্রাস চালু হয়ে যায়? শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের চেতনা আর কবে জাগ্রত হবে? ভারতের কাশ্মীর, রাশিয়ার চেচনিয়া, চীনের জিন জিয়াং, ফিলিপিন্সের সুলু, মায়ানমারের রাখাইনে সন্ত্রাসবাদ এখনও অব্যাহত। ভারত ভেঙে হয়েছে আফগানিস্তান (১৩৭৮), বাংলাদেশ (১৯৭১) আর পাকিস্তান (১৯৪৭)। এগুলির সঙ্গে কি কোরানের কোনো সম্পর্ক নেই, বলবেন? দারুল-হার্ব আর দারুল-ইসলাম, কাফের আর জিহাদের তত্ত্ব কোথা থেকে আসছে? ইন্দোনেশিয়ার বালিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু তারা তো সন্ত্রাস করে আলাদা রাষ্ট্র দাবি করছে না। লাদাখের বৌদ্ধরা কেন আলাদা বৌদ্ধরাষ্ট্র চাইছে না? মালয়েশিয়ায় কেন বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানরা বিচ্ছিন্নতাবাদের আশ্রয়ে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করছে না? তাহলে কী অনুন্নয়ন, অশিক্ষা, দারিদ্র্যই কারণ এই জিহাদের? তাহলে ৯/১১-এর সৌদি এবং পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষিত জেহাদিরা কোনো অনুপ্রেরণায় 'টুইন টাওয়ারের' ৩০০০ নির্দোষ নাগরিককে মেরে ফেলেছিল? জানেন কি, ওসামা বিন লাদেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন? আল কয়দার প্রধান আল জুয়াহিরি একজন চিকিৎসক ছিলেন? বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া রাজ্য কাশ্মীরেই কেন জিহাদ হয়? কাশ্মীরের ৩৭০ আর ৩৫এ ধারার মতো বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পেট্রলের দাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ভারতের অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় অনেক কম। তবুও জিহাদিদের মুক্তাঞ্চল। লেহ, লাদাখ, স্পিতি, অরুণাচল, আন্দামান-নিকোবর ইত্যাদি স্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অপ্রতুলতা, দুর্গমতা, বেকার সমস্যা থাকার সত্ত্বেও সেখানে কোনো জিহাদ হয় না। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের হাল অবস্থাটা কী জানেন? সিরিয়া, ইরাক, ইরানের অবস্থা কীররম?

অর্থাৎ আর্থিক অবনতি, শিক্ষার অভাব, জীবিকার অপ্রতুলতা--- এসব কোনো কারণই নয়! কারণ কোরানের সেই চিরন্তন অনুপ্রেরণার জন্যই এসব স্থানে রোজ জঙ্গি হামলা হয়! এটা বাস্তব সত্য অথচ কমিউনিস্টরা সেটা আড়াল করতে চায়। ইসলামিক দেশে কিন্তু কোনো কমিউনিজম চলে না। শুধু পশ্চিমবঙ্গ, কেরল তথা ভারতেরই নয়, সারাবিশ্বের কমিউনিস্টরা মুসলমানদের সঙ্গী। মধ্যএশিয়া থেকে বহিরাগত বর্বর দস্যুরা আসে ৭০০ বছর আগে ভারতে। চরম নৃশংসতার মাধ্যমে মোগলরা এ দেশে রাজত্ব করে কোটি কোটি হিন্দুকে হত্যা করে 'ইসলামিক দেশ' বানাতে চেয়েছিল। উইল ডুরান্টের লেখা 'দ্য ব্লাডি কনকোয়েস্ট অব ইন্ডিয়া' বইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এত অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হিন্দুরা কেন সন্ত্রাসবাদী হতে পারছে না? দেশ বিভাগের সময়ে অবর্ণনীয় ইসলামিক অত্যাচারের শিকার হয়ে, চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে দেশন্তরী হয়ে, কোটি কোটি মা-বোনের ইজ্জত-সহ সর্বস্ব খুইয়েও কেন হিন্দু-শিখরা সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠতে পারছে না? সেই হিসাবে হিন্দুশিখের ঘরে সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম কেন হচ্ছে না, তাই ভাবি মনে! বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে গিয়ে কেন হিন্দুশিখরা প্রতিহিংসা নেয় না? বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে তো প্রতিদিন হিন্দুনিধন, ধর্মান্তরকরণ যজ্ঞ আর ধর্ষণ হচ্ছে, তবু কেন সেখানে মানুষ জেগে উঠছে না! ফিলিপিন্স, ইরাক, সিরিয়ায় কেন খ্রিস্টান সন্ত্রাসবাদীর সৃষ্টি হচ্ছে না? তিব্বতীরা চীনে গিয়ে কেন সন্ত্রাস করছে না? কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা বর্বর ইসলামিক জিহাদের শিকার হয়েও কেন আত্মঘাতী বোমায় মেহেবুবা মুফতি, ইয়াসিন মালিক আর ফারুক

আবদুল্লাকে শেষ করে দিতে পারছেন না! সবদেশেই তো হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান, শিখ এবং পারসিকরা আছে। তারা সেই দেশের আইন মেনে সেই দেশের ভাষা শিখে সেই সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে সুসভ্য নাগরিকের দায়িত্ব পালন করেছে। ব্যতিক্রম একমাত্র মুসলমানেরা। মুসলমান যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সে মাদ্রাসা খুলেছে, মসজিদ তৈরি করেছে, নিজেদের আরবি ভাষা প্রয়োগ করেছে, শরিয়া আইন মেনে নিজস্ব আদালত করেছে, ফেজ টুপি, দাড়ি আর হিজাবের আড়ালে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে! কাফেরদের দেশকে ঘৃণা করে কিন্তু কাফেরদের দেশের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে তাকে কীভাবে দারুল হার্বে পরিণত করা যায় তারই স্বপ্ন দেখে। অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই 'ঘেটো' বা 'নো গো জোনের' সৃষ্টি করে। যেখানে সাধারণ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিন, পুলিশ পর্যন্ত ঢুকতে ভয় পায়। উদাহরণ মোমিনপুর, খিদিরপুর! চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন আর ধর্ষণ শুধু অমুসলমানদের জন্যই বরাদ্দ থাকে কেন বলুন তো? সভ্যসমাজে মৃত্যুদণ্ড নেই! জেলে বসে কোরান মুখস্ত করা, স্বাস্থ্য চর্চা আর পরবর্তী জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া!

যে কমিউনিস্টরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি আর নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলে, সেই কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নে ভোট দিয়ে সন্ত্রাসকে সাহায্য করেছি আমরা গত তিন দশক! চীনের 'কর্মী'রা কী 'উইঘুরে'র দমন নীতির সমর্থন করে না? চীনে 'হান্' সম্প্রদায়ের মানুষরা কী সেনার সঙ্গে মিলে উইঘুরের জতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের উপর দমন নিপীড়ন চালাচ্ছে? বাইরের লোক জিনজিয়াং-এর উইঘুরে এসে বসতি স্থাপন করছে না? যেমনটা দেখা গেছিল, তিব্বতে, ১৪ থেকে ৪০ বছরের তিব্বতী মহিলাদের জোর করে গর্ভনিরোধক ইঞ্জেকেশন আর বাইরের 'হান' সম্প্রদায়ের লোকদের এনে বসিয়ে স্থানীয় তিব্বতীদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া! সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকাকালীন কমিউনিস্টরা 'চেচেন' মুসলমানদের স্বাধীনতার পক্ষে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্রদের হাতে হেনস্থা
বাবুল সুপ্রিয়র।

ছিল কি? আসলে ভারতীয় উপমহাদেশের কমিউনিস্টরা মুসলমানদের 'গেলেমান' বা ইসলামের অগ্রগামী বাহিনী। ভারতের সর্বনাশই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

এরা হিন্দুনামধারী (সীতারাম) কিন্তু হিন্দুধর্মে ভীষণ এলার্জি অথচ ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরি করতে তাদের বিবেকে বাধে না! সেকুলার হয়েও সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের সঙ্গে একস্বরে গেয়েছিল, 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'। লক্ষ্য করুন, এরা কাশ্মীরি মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা চাই স্লোগান দেয়, কিন্তু চীনের উইঘুর মুসলমানদের জন্য দেয় না! তিব্বতীদের বা বালুচিস্তানের বালুচদের জন্যও নয়। শুধু মুসলমানদের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হবে না, ভারতের সর্বনাশও করতে হবে অর্থাৎ সনাতন ধর্মের নাশ এবং পৃথিবীতে শুধুমাত্র 'ইসলাম' আর 'ইসাই' নামক ধর্মের লোকেরাই বাঁচবার অধিকার পাবে! এ বিষয়ে প্রোফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের লেখা 'দ্য ফাইনাল ক্লাস অব সিভিলাইজেশনস' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কমিউনিস্টরা শুধু কাশ্মীরি মুসলমানদের জন্য ঘড়াঘড়া অশ্রু বিসর্জন করে কিন্তু কাশ্মীরি পণ্ডিত, তিব্বতী বা তাইওয়ানিদের জন্য নয়! কেননা সেটা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে!

আর মানবাধিকার? নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ভুয়ো সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের মৃত্যুই বুঝি শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন? ধর্মীয় কারণে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সাধারণ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু, ধর্ষণ, অমরনাথ যাত্রী বা গোধরার করসেবকদের নিধন, প্রার্থনাস্থল গুড়িয়ে দেওয়াটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? ২০১৭ সালে সারা বিশ্বে মোট ৮৪,০০০ হাজার নির্দোষ সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার হয়েছিলেন! আর নিউজিল্যান্ডে মাত্র ৪৫ জন মুসলমান মরলে তার প্রতিক্রিয়াটা দেখেছেন কি? সন্ত্রাসবাদীরা যখন কাপুরুষের মতো পেছন দিক থেকে অপ্রস্তুত অবস্থায়, রাতের অন্ধকারে 'সফট টার্গেট' লক্ষ্য করে 'ফিদায়েন' আক্রমণ চালায়, ইঁটপাথর ছুঁড়ে পুলিশ মারে, দশ জন মিলে একজন নিরস্ত্র জওয়ানকে পিটিয়ে মারে, তখন সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় না কি? নাকি বামেদের কাছে সম্প্রদায় ভেদে, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা পালটিয়ে যায়? জে এন ইউ-এর কানহাইয়া কুমার অনির্বাণ ভট্টচার্য, শাহেলা রসিদ আর উমর খালিদ, যাদবপুরের দেবাঞ্জন বল্লভ ও তার মদতদাতারা— এরা সবাই কিন্তু কমিউনিজমের আড়ালে ইসলামিক জিহাদ চালাচ্ছে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে জানতে পারবেন! ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''প্রকৃত হিন্দুধর্ম মানুষকে কর্মযোগী করিয়া তোলে, কল্পনাবিলাসী নহে''— আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কর্মযোগীদের জন্য তৈরি করে গিয়েছেন মন্দির— বিজ্ঞানের মন্দির। ১৯১৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় উত্তর কলকাতার বুকে তৈরি করলেন 'বিজ্ঞান মন্দির'। পরবর্তীকালে নাম হয় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সোমবার ১০-৩০ থেকে ৩-৩০ পর্যন্ত সর্বভারতীয় সংগঠন 'প্রজ্ঞা প্রবাহ'-এর দক্ষিণবঙ্গ শাখা 'লোকপ্রজ্ঞা'র ৯৪

অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং স্নাতক-স্নাতকোত্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'অনুভব- দর্শন'-এর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপ্রজ্ঞার দক্ষিণবঙ্গ সংযোজক ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, দক্ষিণবঙ্গ-সহ সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্ত এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেক্টর তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। জ্ঞান শ্রদ্ধাযুক্ত না হলে লাভ করা অসম্ভব। শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত প্রত্যেকের, তার সঙ্গে দরকার অনুভূতি। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই বড়ো বড়ো কাজের ধারক ও বাহক। প্রতিষ্ঠানের অন্য বিজ্ঞানী ড. গৌরব গঙ্গোপাধ্যায় বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি লোকপ্রজ্ঞার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষাগার দেখান। পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানী ড. অতীশ সিংহ রোমান অ্যাফেক্ট সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় বলেন এবং Spectroscopy Machine-টিও দেখান।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে ১০৫টি স্বাস্থ্যশিবির এনএমও-র

সংবাদদাতা॥ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানইজেশন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ১০৫টি স্বাস্থ্য শিবির ১২০৩৭ জনের বেশি দরিদ্র শ্রেণীর রোগীর নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এতে ৩২৭ জন ডাক্তার-সহ বহু স্পেশালিস্ট, সুপার স্পেশালিস্ট, দন্ত চিকিৎসক, চক্ষু চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

রোগীদের নিঃশুল্কে চোখের পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ করা হয়েছে। এই সব শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল মেডিকোজ সংস্থার সেবা ভাবের এক নিদর্শন, যেখানে ডাক্তারেরা স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার উদ্‌যাপন ও প্রচারের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালন করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ভাষণে সারা বিশ্বকে ভারতীয়তা ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা দিয়েছিলেন। এই যাত্রার নামকরণ ভগিনী নিবেদিতার নামের ওপরে রাখা হয় 'ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য সেবা যাত্রা'। ন্যাশনাল মেডিকোজ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, তারা এই শিবির প্রত্যেক বছর পালন করবেন ও তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সমাজের সেবা চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এই একদিবসীয় ১০৫টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়, যা বেশ দুর্লভ।

ভারতের সীমান্ত নিয়ে ইতিহাস রচনায় সবুজ সঙ্কেত রাজনাথ সিংহের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতের সীমান্ত নিয়ে ইতিহাস রচনার জন্য প্রাথমিক কাজকর্ম শুরুর অনুমতি দিয়েছেন। নতুন দিল্লিতে আজ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, নেহরু স্মৃতি সংগ্রহালয় ও গ্রন্থাগারের আধিকারিক, মহাফেজখানার মহানির্দেশক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনাথ সিংহ এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে স্থির হয়েছে, সীমান্ত অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেখানকার সীমানা নির্দেশ , সীমানা তৈরি ও তা পুনর্বিন্যাস, নিরাপত্তা বাহিনীগুলির ভূমিকা, সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ভূমিকা, তাঁদের জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতীয় সীমান্ত নিয়ে ইতিহাস রচনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এই কাজ সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, আধিকারিকদের দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের সীমানা এবং সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে এই প্রথম এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো।

পঞ্চম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবে সভাপতিত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্ (আই সি সি আর) আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানের ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যেই আই সি সি আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এটা বোঝার জন্য রামায়ণ উৎসব ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকতে পারে না। শ্রী শাহ বলেন, পাঁচ বছর ধরে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে আসছে। ১৭টি দেশ থেকে শিল্পীরা এতে অংশ নেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় রামায়ণকে তুলে ধরেন। রামায়ণ হলো এমন এক গ্রন্থ যেখানে ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম বিশ্বাস দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে।

তিনি বলেন, রামায়ণ হলো শতাব্দী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার। একজন আদর্শ মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের ওপর মহাঋষি বাল্মীকির এক অনবদ্য সৃষ্টি হলো এই রামায়ণ। এখানে মানুষের জীবনের উঁচু এবং নীচু দিকটি যেমন খুব ভালোভাবে বর্ণনা করা রয়েছে, তেমনই আদর্শের ওপর প্রশ্নের উত্তরগুলিও দেওয়া রয়েছে। এমনকী, জীবনের কঠিন সময়ে মূল্যবোধের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে।

শ্রী শাহ আরও বলেন, এই গ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সুপ্রশাসন, যুদ্ধের কৌশল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মহিলাদের সম্মান রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও তার দূত হিসেবে রামায়ণকে তুলে ধরতে আই সি সি আর যে প্রয়াস নিয়েছে তার জন্য শ্রী শাহ ধন্যবাদ জানান। রামায়ণ থেকে মূল্যবোধ আত্মস্থ করে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান তিনি।

ব্যারাকপুরে সেনা নিয়োগ শিবিরে জাল নথি-সহ ধরা পড়ল ৫০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ব্যারাকপুরে সেনা নিয়োগ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে টেকনিক্যাল অল আর্মস টেকনিক্যাল (অ্যামুনেশন অ্যান্ড অ্যাভিয়েশন এক্সামিনার), নার্সিং অ্যাসিসটেন্ট, ভেটেরিনারি, জেনারেল ডিউটি, ক্লার্ক, স্টোর কিপার এবং ট্রেডসম্যান বিভাগে সৈনিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সৈনিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ব্যারাকপুরের আরসিটিসি স্টেডিয়ামে গত ১৫-২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিয়োগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ২০ হাজার কর্মপ্রত্যাশী শিবিরে যোগদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আবেদনকারী প্রার্থীদের যাচাইয়ের সময় সেনাকর্মীদের নজরে আসে যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে ৫০ জন প্রার্থী জন্ম শংসাপত্র, রেশনকার্ড, আধার, ভোটার পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঠিকানা সংক্রান্ত জাল নথিপত্র জমা করেছেন। জমা দেওয়া জাল নথিপত্রগুলিতে উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কর্নেল এস হেমন্ত নাথ ব্যারাকপুর পুলিশ থানায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই ৫০ জন প্রার্থীর কাছ থেকে জাল নথিপত্র ও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে দালালদের প্রলোভনে পড়েই উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলের এই প্রার্থীরা ব্যারাকপুরের নিয়োগ শিবিরে সৈনিক পদের জন্য আবেদন জানায়। সূত্রে খবর, প্রার্থীরা জাল নথিপত্র সংগ্রহের জন্য দালালদের ন্যূনতম ২ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন। সৈনিক পদে মনোনিত হলে দালালদের ২-৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও মনে করা হচ্ছে। শিবির শুরু হওয়ার প্রায় সপ্তাহ খানের আগেই এই প্রার্থীরা জাল নথিপত্র সংগ্রহ করার জন্য কলকাতায় চলে আসেন বলে সেনা সূত্রে জানা গেছে।

সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা জানিয়েছেন কর্ম-প্রত্যাশীরা বহুবার দালালদের মিথ্যা আশ্বাসে প্রলোভিত হয়ে তাদের টাকা দিয়েছেন এবং জাল নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর্মপ্রত্যাশীর জমা পড়া নথিপত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পুনরায় যাচাই করে দেখছেন।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় সুফলভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়ালো

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনায় সুফলভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের বর্ধিত পুষ্টি চাহিদা মেটানো তথা সাময়িক উপার্জনে ঘাটতির জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এই খাতে সরকারের ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-র পয়লা জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচির সূচনা ও রূপায়ণ চলছে। কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েরা তিন কিস্তিতে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও, জননী সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে আরও এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই দুই কর্মসূচি থেকে মহিলারা গড়ে ৬ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা রূপায়ণে দেশের অগ্রণী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলো—মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং রাজস্থান। ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় এই কর্মসূচির রূপায়ণ এখনও শুরু হয়নি । কর্মসূচি রূপায়ণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক আঞ্চলিক পর্যায়ে গুয়াহাটি, জয়পুর ও চণ্ডীগড়ে সম্প্রতি কর্মশিবিরের আয়োজন করেছে। মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপকৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ১০ জন। সারা ভারতে সুফলভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ১১ হাজার ২০০ জন।

কাশ্মীর সমস্যা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির ফসল

নিধুভূষণ দাস

এরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার অভিভাবক— কেউ রাজনীতিক, কেউ সমাজ-কর্মী, কেউ বুদ্ধিজীবী বা বিশিষ্টজন। কেউ কেউ বামপন্থী, অতি-বাম তথা মহান প্রগতিশীল। তারা মনে করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যা কিছু করছেন সবই দেশের স্বার্থবিরোধী এবং তাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কোনো ভালো কাজ হচ্ছে না। ভালো কাজ করার একচেটিয়া অধিকার ও ক্ষমতা শুধু এই তথাকথিত প্রগতিশীলদের।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার পর যেসব মুসলমান ভারতে থেকে যান তারা, বলা বাহুল্য, পাকিস্তান নয়, ভারতকেই স্বদেশ হিসেবে বেছে নেন। কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ ছিল ভারতভুক্তির পর দশকের পর দশক। ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীলদের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ শাসন সেই সময়ে সংখ্যালঘুদের নিয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করার পরিণতিতে মুসলমান সমাজ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং মোল্লাতন্ত্র এই অনগ্রসরতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পশ্চাদগামী ভাবনার বীজ বপনে বহুলাংশে সফল হয়। জম্মু-কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা বরাবরই তিনটি মুসলমান পরিবারের হাতে থেকেছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারায় বিশেষাধিকার কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরের মুসলমানদের মসজিদকেন্দ্রিক ধর্মের আফিম খাইয়ে এরা ইসলামিক মৌলবাদের বিকাশ নিশ্চিত করেছেন। ফলে সার্বিক বিকাশের পথ রুদ্ধ থেকেছে, কিছু মানুষকে নিয়ে এক সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি করা হয়েছে যাতে শাসক শ্রেণীর সমষ্টিগত স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ভূস্বর্গের আর্থ-সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ বরাবরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

কাশ্মীরের পণ্ডিতদের এরা বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার এই অভিভাবকদের কাছে তখন মনে হয়নি, এখনও মনে হয় না যে, পণ্ডিতদের মানবাধিকার বলে কিছু আছে এবং ওদের নির্যাতিত না হওয়ার অধিকার আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রগতিশীলতার নামে এই নিদারুণ ভণ্ডামিই ভারতে ইসলামিক মৌলবাদের কারণ।

কিন্তু তখন ভারতের এই প্রগতিশীলদের ঘুমন্ত বিবেক জাগ্রত হয়নি। তাদের বিবেক শুধু ক্ষেত্রবিশেষে জাগে, যেমন এখন জেগেছে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এ ধারা বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে। এখন আবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছেন শেহলা রশিদ শোরা নামে একজন। তিনি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, বাড়ি কাশ্মীরের শ্রীনগরে। তিনি কাশ্মীরের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে কাশ্মীরের পণ্ডিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা তার বিবেককে নাড়া দেয় না। তিনি যে ছাত্র সংগঠনের মনোনয়ন নিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তা একটি নকশাল সংগঠনের ছাত্র ফ্রন্ট। এই নকশাল সংগঠনটি সংসদে জঙ্গি হানার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আফজল গুরু এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মকবুল ভাটের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতায় সোচ্চার। রশিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানোর। সম্প্রতি দিল্লির যন্তরমন্তরে কাশ্মীর নিয়ে ডিএমকের ডাকা বিক্ষোভ সমাবেশে হাজির ছিলেন রশিদ। মঞ্চে উপবিষ্ট সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাতের সঙ্গে রশিদকে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করতে দেখা যায়।

ভারতের কমিউনিস্টদের সোভিয়েত ইউনিয়নে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব থাকতে দেখা গেছে। নোবেলজয়ী ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত উপন্যাস The Gulag Archipelago-এ উঠে এসেছে সেই ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পর ১৯৯৪ সালে তিনি দেশে ফেরেন। আজ যারা কাশ্মীরের মানুষের মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার তাদের কাছে সোলঝেনিৎসিনের মানবধিকারের মূল্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে বৃন্দা কারাত, সীতারাম ইয়েচুরিদের সিপিএম দলের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতায় বালিগঞ্জের কাছে বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী এবং একজন সন্ন্যাসিনীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটলেও এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। রশিদ, বৃন্দা, ইয়েচুরি, ডি রাজার মতো 'প্রগতিশীল' নেতা-নেত্রীদের কাছে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মানবাধিকার স্বীকৃত কিন্তু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের বেঁচে থাকার এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজ বাসভূমে থাকারও অধিকার নেই। একে ভণ্ডামি ছাড়া আর কীই বা বলা যায়! ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

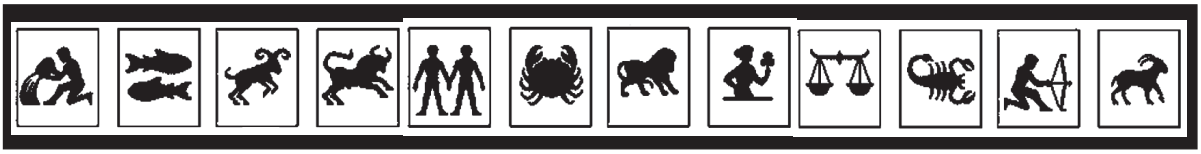

৩০ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ৬ অক্টোবর (রবিবার) ২০১৯।
সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি, মঙ্গল, শুক্র, তুলায় বুধ, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, কেতু।
০৪-১০-১৯, শুক্রবার, রাত্রি ২-৪০ মিনিটে শুক্রের তুলায় প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় চিত্রা নক্ষত্র থেকে ধনুতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সৃজনময়তায় বিদ্যার্থী, গবেষক, প্রতিষ্ঠানের প্রধানের, ভাস্কর্য ও শিল্প রসিকদের প্রতিভার ব্যাপ্তি। বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও সমাদর। স্বজন বাৎসল্য, পুত্রের সফল মনস্কাম ও পৈতৃক ব্যবসায় নব দিগন্তের সূচনা। সপ্তাহের শেষভাগে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট, আঘাত। স্ত্রী ও কন্যার ভেদ ব্যয়াধিক্যের কারণ।

বৃষ : সন্তানের ক্যালকুলেটিভ চিন্তা, উপন্যাস, চটুল ম্যাগাজিন, ফেসবুক ও গুপ্তবিদ্যায় মনঃসংযোগ। সহোদর ও যুবক মিত্র পারিবারিক জটিলতার কারণ। কর্মে পদস্থ ব্যক্তির সুখ্যাতি, স্ত্রীর বৈষয়িক উন্নতি ও সম্পত্তি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পরামর্শ। দরদি মনে প্রেমের পূর্তি।

মিথুন : কর্মে সহকর্মীর ঈর্ষা-সমালোচনা। শান্ত-সংযত ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিন। জ্ঞানার্জনে অবসাদ, বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনে অসমর্থ। ভালবাসার যাতনায় স্বপ্নভঙ্গ। বিলাস দ্রব্য ক্রয়। কান ও বাতজ বেদনায় অপ্রত্যাশিত ব্যয়।

কর্কট : কর্মক্ষেত্রে প্রভাব ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সফল প্রয়াস। সহোদরের বিরোধিতা সত্ত্বেও পিতার পরামর্শে পারিবারিক সুস্থিতি। বস্ত্র, অলংকার, স্টেশনারি, খনিজ, চর্ম ও জলজ দ্রব্যের ব্যবসায় ধনার্জন। কর্মপ্রার্থীর প্রতিষ্ঠা তবে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। ভ্রমণে ক্লেশ ও উদ্বেগ।

সিংহ : সহকর্মীর সৌজন্যের রীতি লঙ্ঘিত হলেও নিজ অগ্রগতিতে কর্তৃপক্ষের শংসা বজায় থাকবে। গুণীজনের সান্নিধ্য, সামাজিকতায় সুনাম। স্ত্রীর নামে ব্যবসা ও উপার্জনের একাধিক পন্থার সন্ধান। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা, ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহার ও সঠিক চিন্তার বাস্তবায়ন।

কন্যা : পরিবারে অসুস্থতা কথাবার্তায় আড়ষ্টতা, অসঙ্গত প্রেমের বন্যায় প্লাবিত অন্তর। কর্মপ্রার্থীদের বুদ্ধিমত্তায় প্রতিকূলতার অবসানে সিদ্ধি করায়ত্ত। অপ্রিয় সত্যকথনে বিড়ম্বনা। সন্তানের উদাসী মনোভাবে উদ্বেগ। প্রাপ্তি অধরা থাকায় আয় ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন।

তুলা : গুপ্ত শত্রুতা, স্ত্রী-ঘটিত অশান্তি, মাতার কষ্ট, স্থানান্তর, ব্যর্থতা, কর্তব্যে ত্রুটি, সম্মানহানি। সপ্তাহের শেষভাগে অমানিশার অবসানে ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকায় প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ, জগতের আনন্দযজ্ঞে সঞ্জীবনী শক্তিলাভ।

বৃশ্চিক : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে, পুত্র কল্যাণে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখাদ্য ভোজনে ব্যাপৃত মন। অংশীদারদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উন্নতি। নতুন বিনিয়োগ, পারিবারে সুখ বৃদ্ধির যোগ ও অর্থাগমের বিকল্প পথের সন্ধান। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধির সহায়ক। সপ্তাহের শেষভাগে নীচ সংসর্গ-বিধিবহির্ভূত কাজ। চুরির ভয় ও অপ্রত্যাশিত সমালোচনায় উদ্বেগ।

ধনু : পরিশ্রম ও যোগ্যতার তুলনায় প্রাপ্তি আশাব্যঞ্জক নয়। স্বনির্ভর কর্ম ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা। জ্ঞাতি বিরোধ, মাতার স্বাস্থ্য, বন্ধুর পদক্ষেপে মানসিক অস্থিরতা। সপ্তাহের শেষভাগে পিতৃ বিয়োগ ও গুরুজনের আশীর্বাদে শুভ কর্মপথে নিজ দক্ষতার স্বীকৃতি ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য তবে আর্থিক দিক সুখকর নহে।

মকর : আয়ের শ্লথ গতি। আর্থিক লেনদেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রিয়জনের মন্দ ব্যবহারে চিত্তভূমি উদ্বেলিত হওয়ার সম্ভাবনা। সামাজিকতায় মানবিক সখ। সপরিবারে ভ্রমণ। নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তি বিলম্বে। জ্ঞানার্জনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রয়াস।

কুম্ভ : আধিপত্য, সমৃদ্ধি, পুত্রলাভ। স্ত্রী-পুত্রের সাফল্য, সৎকীর্তি,ভূমি, গৃহ ও বাহন যোগ। সুধীজনের সঙ্গ, ঋণমুক্তি, বিভিন্ন যোগাযোগ কর্মব্যস্ততা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীর পেশাগত উন্নতি। সমাজকল্যাণে জনপ্রিয়তা, পরিচিত অথবা বয়স্ক মিত্র দ্বারা আর্থিক ক্ষতি।

মীন : শরীরের যত্ন নিন। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়াধিক্য। জীবনে চলার পথে সজ্জনের সহযোগিতা, চাকরিজীবীদের দায়িত্ববৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি, বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ। বাড়তি কথায় প্রতিবেশীর বিরূপতা। শিল্প ও সৌন্দর্য সুধায় গৃহলক্ষ্মীর অভীষ্ট লাভ। একাধিক ভ্রমণ যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য